কবিতা

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : সমর সেন

পঞ্চম বর্ষ : আশ্বিন, ১৩৪৬—আষাঢ়, ১৩৪৭

বার্ষিক সূচীপত্র

অজিত দত্ত	
রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ (সমালোচনা)	আশ্বিন ৭৩
শারদীয় ভাব	কার্তিক ৩৭
সাহিত্য-সম্মেলন বিষয়ে (প্রবন্ধ)	" ৬৩
ছুটি চীনে কবিতা	চৈত্র ২১
অতুলচন্দ্র গুপ্ত	
কাব্যে অদ্বৈতবাদ (প্রবন্ধ)	কার্তিক ৫২
অনিলেন্দু চক্রবর্তী	
তিনটি কবিতা	পৌষ ৩৭
অনুপম গুপ্ত	
খবর	কার্তিক ৪৭
অডেনের 'স্পেন' অনুসরণে	আষাঢ় ২৫
অমিতাভ ঘোষ	
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যঃ	কার্তিক ২২
ধর্মস্য তত্ত্বম্	" "
কিস্তিশোধের বাস্তবতা	পৌষ ৩৪
দুপুরবেলার চম্পূ	চৈত্র ১৪
অমিয় চক্রবর্তী	
চেতন স্যাকরা	কার্তিক ৫
অশোকবিজয় রাহা	
ফাল্গুন	আষাঢ় ১৭
আবুল হোসেন	
শক্তিহারা	আশ্বিন ৪৫
সঙ্গীত	পৌষ ৩১
বাংলার মেয়ে	চৈত্র ২৯
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	
মৃত্যুবাণ	আশ্বিন ৩১
মাকড়সা	" ৩৩
সন্ধ্যা	কার্তিক ৯
সময় কাটে না	পৌষ [illegible]

বিশেষ পূজা সংখ্যা

মোড়	চৈত্র ৩৯
বর্ষশেষ	আষাঢ় ১১
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	
ডক্	কার্তিক ৭৩
শীত রাত	পৌষ ২৬
আজ বসন্তে	চৈত্র ৪২
পুরোনো পৃথিবীর প্রতি	আষাঢ় ১৮
চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়	
দস্তু	আশ্বিন ৫৮
কয়েকটি কবিতা	কার্তিক ৯৭
একটি পুতুল, তার চিন্তা, তার শা'	পৌষ ৩০
তিনটি কবিতা	চৈত্র ১২
জীবনানন্দ দাশ	
সুমেরীয়	আশ্বিন ২৮
মৃত্যু	,, ২৯
আমিষাশী তরবার	,, ৩০
হেমন্ত	কার্তিক ৭
নিঃসরণ	,, ৮
বিস্ময়	পৌষ ২৪
তিনটি কবিতা	চৈত্র ৫
মনোবীজ	আষাঢ় ৪
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র	
রথযাত্রা	আশ্বিন ৫
বহুব্রীহি	কার্তিক ৩১
পটভূমি	পৌষ ৩৩
ত্রৈলোক্য বিশ্বাস	
দুটি কবিতা	কার্তিক ৪৬
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	
একটা প্রেমের গান	আশ্বিন ৪৪
আধুনিক বাংলা গল্প (সমালোচনা)	,, ৬৭
বৃন্দাবন	কার্তিক ৪১
পলাতকা	পৌষ ২৮
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	চৈত্র ৬৩
As for me, I had......	আষাঢ় ৩৯
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	
ভোর	আষাঢ় ১৯
ঝিনুক	,, ২০

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
ট্র্যাজিডি	কার্তিক ৩৭
নিমেষ রায়	
অনুর্বরা	কার্তিক ২৩
প্রলয়	চৈত্র ৪০
নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	
সামুদ্রিক	আশ্বিন ৪২
নিশিকান্ত	
শাদা মেঘ	কার্তিক ৪৩
গানের পাখী	চৈত্র ২০
বরণীয়	আষাঢ় ২২
পরিমল রায়	
চিন্তাহরণের চালাকি	কার্তিক ৪২
প্রজেশকুমার রায়	
সূর্যাস্তে	চৈত্র ৪১
প্রবোধ ঘোষ	
মহাকাব্যের পরিশিষ্ট	কার্তিক ৪৫
প্রমথ চৌধুরী	
আত্মকথা	কার্তিক ৪৯
প্রথমনাথ বিশী	
অকুন্তলা	কার্তিক ১০
ক্যালকাটা রোডে	পৌষ ১৩
শর্বরী	চৈত্র ৩৬
বিলাপ	,, ৩৮
ফররুখ আহমদ	
বন্ধন	আশ্বিন ৪০
স্মরণ	,, ৪১
বিভূতি চৌধুরী	
মাঝরাতে : ট্রেনে	চৈত্র ৪৬
আজ আর কাল	আষাঢ় ৩৪
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	
সমুদ্র	আশ্বিন ৫৩
সংযম	কার্তিক ২৫
বর্ষা	পৌষ ২৩
সোনার সিঁড়ি	চৈত্র ,,
আকস্মিক	আষাঢ় ১৪

বিষ্ণু দে
কোনো কমরেডের বিবাহে — আশ্বিন ২৪
বিদায় — ,, ২৫
সৌখীনতায় হারালুম জীবন — ,, ২৬
"এ যুগের চাঁদ হ'লো কাস্তে" — কার্তিক ৩
বঞ্চনা — পৌষ ৩৯
ছুটি — চৈত্র ১৬
বৈকালী — আষাঢ় ৫১

বিষ্ণু ভট্টাচার্য
স্বপ্ন ভাঙা — চৈত্র ২৫

বুদ্ধদেব বসু
পূর্বরাগ — আশ্বিন ৫
বিরহ — কার্তিক ২৮
দময়ন্তী — পৌষ ৩
বৃষ্টি আর ঝড় — চৈত্র ১৭
জন্ম — ,, ১০
বাঙালি বুদ্ধিজীবী, ১৯৪০ — আষাঢ় ৩৭
নতুন কবিতা (সমালোচনা) — আশ্বিন, ৬৩ ; পৌষ ৪৫ ; চৈত্র, ৪৭ ; আষাঢ়, ৪৪
রবীন্দ্র-রচনাবলী (সমালোচনা) — পৌষ, ৪৯ ; চৈত্র, ৫৫ ; আষাঢ়, ৫১
গদ্য ও পদ্য (প্রবন্ধ) — কার্তিক ৫৬

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
মুক্তি — চৈত্র ২২

মণীন্দ্র রায়
স্বদেশ — আশ্বিন ৬১
পথনির্দেশ — ,, ৬২
পাথর-কুমারী — কার্তিক ৪০
পঙ্কাঙ্ক — চৈত্র ১১

মিহিরকুমার বসু
দিনশেষে — কার্তিক ৩৯
নিশীথে — ,, ,,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শেষ হিসাব — আশ্বিন ১
রোম্যান্টিক — পৌষ ১
বিপ্লব — চৈত্র ১
আসা যাওয়া — আষাঢ় ১
ক্ষণিক — ,, ২

রবীন্দ্রনাথ সরকার
বিলাসী — আষাঢ় ২১

সমর সেন
বিরতি — কার্তিক ২৭
পলাতক — পৌষ ৪০
হসন্তিকা — চৈত্র ৪৩
রোমন্থন — আষাঢ় ৩০

সমীর ঘোষ
মনোবিকলন — চৈত্র ২৭

সরোজরঞ্জন আচার্য
পলায়নী — চৈত্র ৩৮

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
"এ যুগের চাঁদ হ'লো কাস্তে" — কার্তিক ২
ব্যবধান — পৌষ ৪৩

সুপ্রভা দত্ত
গ্রামপান্তের বন — আষাঢ় ২৮

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
আলাপ — আশ্বিন ৫৯
প্রস্তাব — কার্তিক ২৬
কাব্যজিজ্ঞাসা — পৌষ ৪১

সুরেশচন্দ্র সরকার
মিনার-বাসী — আশ্বিন ৩৮
চীন-জাপান — কার্তিক ৩৬
কু-সানের অর্হৎ — আষাঢ় ১৫

হরপ্রসাদ মিত্র
লেকে, সন্ধ্যায় — আশ্বিন ৩৫
দিবাঘুম — কার্তিক ৪১

হুমায়ুন কবির
অমাবস্যা — কার্তিক ৩৪

হেমচন্দ্র বাগচী
ছুটির দিনে — আশ্বিন ১৪
মহাসারথি — ,, ১৮
দু'দিন — কার্তিক ১৯
গঙ্গা — পৌষ ১৯
শিল্পীর দৃষ্টিতে — চৈত্র ৭
বর্ষার কাব্য — আষাঢ় ৮

কবিতা

পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৪৬ ক্রমিক সংখ্যা ১৮

শেষ হিসাব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চেনা শোনার সাঁঝবেলাতে
শুনতে আমি চাই
পথে পথে চলার পালা
লাগল কেমন ভাই।
দুর্গম পথ ছিল ঘরেই,
বাইরে বিরাট পথ,
তেপান্তরের মাঠ কোথা বা
কোথা বা পর্ব্বত।
কোথা বা সে চড়াই উঁচু,
কোথা বা উৎরাই,
কোথা বা পথ নাই।
মাঝে মাঝে জুটল অনেক ভালো,
অনেক ছিল বিকট মন্দ,
অনেক কুশ্রী কালো।
ফিরেছিলে আপন মনের
গোপন অলিগলি,

পরের মনের বাহির দ্বারে
পেতেছ অঞ্জলি।
আশাপথের রেখা বেয়ে
কতই এলে গেলে,
পাওনা বলে যা পেয়েছ
অর্থ কি তার পেলে ?
অনেক কেঁদে কেটে
ভিক্ষার ধন জুটিয়েছিলে
অনেক রাস্তা হেঁটে।
পথের মধ্যে লুঠেল দস্যু
দিয়েছিল হানা,
শূন্য করে দিয়েছিল
ছিন্ন ঝুলিখানা।
অতি কঠিন আঘাত তারা
লাগিয়েছিল বুকে,
ভেবেছিলুম, চিহ্ন নিয়ে
সে সব গেছে চুকে।

হাটে বাটে মধুর যাহা
পেয়েছিলুম খুঁজি
মনে ছিল যত্নের ধন,
তাই রয়েছে পুঁজি।
হায়রে ভাগ্য, খোলো তোমার ঝুলি,
তাকিয়ে দেখ, জমিয়েছিলে ধূলি।
নিষ্ঠুর যে, ব্যর্থ হতেই
করে সে বঞ্চিত,
দৃঢ় কঠোর মুষ্টিতলে
করেছে সঞ্চিত
নিত্যকালের রতন কণ্ঠহার ;
চির মূল্য দিল তারে
দারুণ বেদনার।

আর যা কিছু জুটেছিল
না চাহিতেই পাওয়া
আজকে তারা ঝুলিতে নেই,
রাত্রিদিনের হাওয়া
ভবুল তারাই, দিল তারা
পথে চলার মানে,
রইল তারাই একতারাতে
তোমার গানে গানে ॥

পূর্বরাগ (২)

বুদ্ধদেব বসু

ভাঙাও ভাঙাও সূর্যের ঘুম তবে,
জাগাও জাগাও শিশু-সূর্যের কুঁড়ি,
জালাও জালাও ভাঙা হৃদয়ের শুকনো ডালে
সূর্যের মঞ্জরী।

পাষাণ ফেটে আকাশে ফোটে আশার রংমশাল
দিগন্তে লাল আগুন জলে,
রাত্রি কাঁপে বিদ্যুতের তীব্র চাপ্পে,
জীর্ণ জরা ঝরার এলো দিন।

রাত্রি হ'লো তরুণী, তারে বরণ করো,
সীমন্তে তার শত তারার সীমান্ত,

অন্ধকারে যৌবনের বহ্নিগান
পাষাণ-ভাঙা আকাশে করে রাঙা।

পাষাণ-ভাঙা আকাশে রাঙা আগুন জ্বলে
চৈত্র হাওয়ায় মুক্ত প্রেমের পদধ্বনি
আত্মরতি-মুক্ত প্রেম মৃত্যুহীন
ছিন্ন করে ক্ষুদ্র ঘরে রুদ্ধ দিন।

এবার তবে ধরণী হবে তরুণী, তারে বরণ করো,
রক্তে জ্বালো দুঃসাহসের বহ্নিগান।
জীবনে করো নতুন, আর যৌবনেরে তরুণতরো,
এবার সবি নতুন করো।

ঝরাও ঝরাও জীর্ণ জরার হলদে পাতা,
ছড়াও ছড়াও সূর্যের লাল বীজ।
জ্বালাও জ্বালাও ভাঙা হৃদয়ের শুকনো ডালে
সূর্যের লাল উজ্জ্বল মঞ্জরী।

পৃথিবী সূর্যের শিশু, আমরা যে সূর্যেরি সন্তান।
কতকাল, কতকাল এ-উজ্জ্বল উত্তরাধিকারে
বঞ্চিত, বাঁচিবে প্রাণ? উদ্দাম, আদিমতম পিতা,
হে সূর্য, হে মহাবীর্য, তোমার বন্দনাগান যদি
আমারও আনন্দগান নাহি হয়, ব্যর্থ তবে সব
কারুশিল্প, কবিতার বাণীমূর্তি। দাও ফিরে দাও
তোমার জ্যোতির স্পর্শ আমাদের রক্তে, হে ভাস্বর,
আঁকো তব জ্বলন্ত স্বাক্ষর মর্মমূলে। বিস্মৃত অতীত
শত লুপ্ত শতাব্দীর সুরঙ্গে জাগায়ে প্রতিধ্বনি
তোমারি উত্তাল নৃত্যে আবর্তিত করুক রক্তের
তপ্তস্রোত; সে-দিন আসুক ফিরে, যে-আদিম দিনে
তোমারি বীর্যের বীজে গর্ভবতী হ'তো এ-পৃথিবী,
তোমারি মঞ্জরী ছিলো মানুষের দীপ্ত বংশাবলী।

ফোটাও, ফোটাও শিশু সূর্যের কুঁড়ি
হে বীর, কবিকিশোর,

তামসী রাত্রি, থমথমে ঘুমে রুদ্ধশ্বাস
হানো তার বুকে চৈত্র হাওয়ার সর্বনাশ,
রাত্রিশেষের দুঃস্বপ্নের পাষাণ-পটে
ঝলসি' উঠুক তোমার বাহুতে সূর্যের তলোয়ার।
বসন্তদিন এলো বুঝি ঐ এলো।

এ দীর্ঘ ঘুমে হানো, হে বীর কবিকিশোর,
দীপ্ত দারুণ সূর্যের দুঃসহ তলোয়ার,
নব বসন্ত আনো ভাঙো দুরন্ত দক্ষিণ,
চৈত্র-রাতের স্বপ্ন-ভাঙানো স্বপ্নের ঝড় তোলো,
আসে বসন্তদিন।

এসো তবে গড়ি সূর্যের মন্দির।
আনো সৌরভ, আনো সঙ্গীত সঞ্জীবনী,
হানো আকাশে অশান্ত আনন্দধ্বনি,
আনো অকুণ্ঠ নির্ভয় প্রণয়বাণী
আনো নৃত্যের চঞ্চল মঞ্জীর।

দ্যাখো গলিত তুষাররাশি স্বপ্নচূড়ায়
ঝরে নির্মম কর্মের ঝরনা ধারায়
লাগে বুদ্ধিতে উৎসাহী হাওয়া ;
করো চিরযৌবনা এই ধরিত্রীরে,
দাও মুক্তি শৃঙ্খলিত প্রবৃত্তিরে,
হিংস্রুক প্রকৃতিরে তৃপ্ত করো।
যার লাঙল চলে তারি ফসল ফলে এই সৌর রীতি।
হল- কর্ষণে স্বর্ণিল শস্য ঝলে, দিগন্তে স্বর্ণিমা উজ্জ্বল হে।
প্রিয় কর্মের উৎসাহে মুক্ত জীবন,
প্রিয়া- সঙ্গমে রক্তের উত্তরায়ণ,
আজ প্রেমের ঋতু ওরে প্রেমের ঋতু।

দিগন্তে স্বর্ণিল শস্য আন্দোলিত উর্মিল বাতাসে।
ইতিহাস মৃত্যুহীন। কালের কুঞ্চিত যাত্রাপথে
পুরোনো স্মৃতির স্তূপ—শুধু স্মৃতি? না কি পূর্ণতার
সর্পিল সোপান? হে বন্ধু, দুর্গম এই আরোহণী

সঙ্কীর্ণ, শঙ্কিল ; তবু যাত্রা করো। দূরে দেখা যায়
সূর্যের মন্দিরচূড়া উঠে গেছে উদ্দাম আশ্বাসে
স্বপ্ন-নীহারিকাচ্ছন্ন কল্পনার জ্যোতিষ্ক-আলয়ে।
যদি সেথা যেতে পারো, যদি সেই মহান নির্জনে
বক্ষ তব নাহি কাঁপে, আঁখি তব ঘুমে নাহি ঢুলে,
তবে সেই তারা-জলা রুদ্ধশ্বাস চূড়ায় দাঁড়ায়ে
চেয়ে দেখো পৃথিবীর উতরোল বসন্তবন্যায়,
সূর্যের মঞ্জরী জ্বলে মানুষের অনন্ত সন্ততি।

তখন কবিরে তুমি ক্ষমা কোরো। ভেবে দেখো মনে,
যদিও সে-পলাতক মূঢ়, গ্রাম্য কুম্ভকারসম
আপনার কারুকর্মে ব্যস্ত ছিলো, যবে রাজপথে
জন-গণ-নায়কের জয়ধ্বনি ছিঁড়েছে আকাশ,
যদিও সে-অজ্ঞ মন মগ্ন ছিলো ধ্বনির কুহকে,
প্রিয়ার বেণীর পাশে যদিও সে, নির্লজ্জ, জড়িত,
তথাপি এ-মন্দিরের উজ্জীবনী মন্ত্র তারি বাণী,
তারি সৃষ্টি এ নির্জন তারা-জলা রুদ্ধশ্বাস চূড়া।

'সূর্যদেব, উদ্দাম, আদিমতম পিতা, হও তুমি
আজ হ'তে আমাদের একমাত্র, একচ্ছত্র রাজা
অরাজক এ-জগৎ অজারজ হোক্ পুনর্বার,
দাও সব পৃথিবীরে উল্লসিত সৌর নরনারী।

এবার তবে বসন্তদিন।

ঝরিয়ে দিলো জীর্ণ জরার শুকনো পাতা
রুদ্ধ ঘরে রুদ্ধ মনের পাণ্ডুরতা
কর্মহীন আলস্যের ব্যর্থ দিন
চৈত্র হাওয়া দুরন্ত।

তীব্র আশার দৃপ্ত জয়ের উদ্দীপনা,
মুক্ত প্রেমের দীপ্ত পথের উন্মাদনা,
দুঃসাহসের উচ্চকিত উজ্জীবনা,
শান্তি আঁকা বাঁকা চাঁদের ইঙ্গিতে।
এলো উতল বসন্ত।

চৈত্র হাওয়ার স্বপ্ন-ভাঙা স্বপ্ন-ঝড়ে
আলস্যের হতাশ্বাস ধূলায় ঝরে,
চমকে ওঠে বুদ্ধিজীবী রক্তহীন—
হঠাৎ এ কী মুক্তি, কী আনন্দ !

তিক্ত শ্রমে অর্থাগমের ব্যর্থ দিন
চৈত্র হাওয়ায় হলদে পাতা,
কর্ম সে তো মুক্তি-পথের নৃত্য-লীলা,
ক্লান্তি আনে ঘুমের গানে শান্তি-ঝরা
চাঁদের চির লাবণ্য ।

চৈত্র হাওয়ায় মৃত্যু হ'লো শুকনো পাতা—
আবশ্যিক আলস্যের অকাল জরা,
ব্যর্থতার তিক্ত শ্রমে নিত্য মরা—
কর্ম সে তো শ্যামল শাখে ফুল ফোটানো,
ক্লান্তি শুধু ঝরায় জরা ।
এবার এলো বসন্তদিন ।

আকাশ-ভরা আলো ।
দীপ্ত চোখে যৌবনের বন্যা জালো ।
মরণে করো উদ্যাপন, জীবনে করো উজ্জীবন,
বাতাসে হানো সূর্য-ঝরা বীজ ;
কল্পনারে মুক্ত করো, কর্ম-রথে যুক্ত করো—
সব্যসাচী, তোমার হোক জয় !

ছুটির দিনে

হেমচন্দ্র বাগ্‌চী

শুয়ে আছি।
আশ্বিনের রোদ্দুরে
কাঁঠাল গাছের পাকা পাতা
পড়্‌ছে ঝ'রে।
ছেলেমেয়ের মেলায়
একটি রোগা শালিখ
ঘুর্‌ছে নির্ভয়ে।
একটি কাক এল
একটি লাল টুকটুকে লঙ্কা
মুখে ক'রে গেল উড়ে।
সদর রাস্তায়
চ'লেছে ঘোড়ার গাড়ী
সপাসপ্‌ চাবুকের শব্দ আসে।
পূজোর ভিড় লেগেছে রাস্তায়
আশ্বিনের রোদ্দুরে নানা রঙের মিছিল।

যেদিকে চাই
দেখি শুধু বন—ঘন, নিবিড়।
কাঁঠাল সজ্‌নে কচা নেবু
আম বাঁশ তেঁতুল—একত্রে মিশে
একটি অরণ্য—
পূজোর হোমের গন্ধ আসে—
বোধন-মন্ত্রের ধ্বনি।

আশ্বিনের রোদ্দুর,
পাশেই ছায়া—
দূর্ব্বার শ্যামলতা।
গাঢ় নীল আকাশ—
অত্যন্ত চেনা হাল্‌কা সাদা মেঘ ভেসে যায়।
নীচে অরণ্যের তরঙ্গ উঠেছে,
পৃথিবীর পূজার অর্ঘ্য যেন।

নদী একটি বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে
বর্ষার ঘোলা জল বনের গা ঘেঁসে চলেছে
অবিশ্রাম।
নদী, বন, মানুষ।

খিড়কি দরোজা দিয়ে
ঢুক্‌ল একটি গরু—
ঘাস খেতে লেগেছে সে নির্ভয়ে।
এক-একটি পাকা নেবু
পড়্‌ছে খ'সে টুপটাপ ক'রে।
উড়ে চ'লেছে প্রজাপতি, ফড়িং—
মধুর রৌদ্রে চোখে আর মনে ধরেছে নেশা।
শুয়ে আছি নিমীলিত চোখে।
পেগান বনদেবতা প্যানের মত—
আশ্বিনের হাল্‌কা হাওয়ায়

ঝ'রে পড়ছে কাঁঠাল পাতা
নিঃশব্দে দুর্ব্বার উপর্।
সেই হাল্‌কা হাওয়া চলেছে
বন থেকে বনে, মাঠে নদীতে,
মন থেকে মনে, মানুষে মানুষে সুদূরে—
মন আমার বলে
হায় উদাসিনী,
কাজ তোমার চলে গোপনে গোপনে
আর, বাইরের আবরণ তোমার
শ্যামল, নির্ব্বিকার, গূঢ়, গম্ভীর!

মহাসারথি

হেমচন্দ্র বাগচী

হে সারথি
তুমি ঝড় বহাও।
দেখেছি তোমার রথের নীচে
মানুষের চক্রাকার পিণ্ড দেহ !
ভীষণ সুন্দর সারথি
তুমি ঝড় বহাও।

আজ মুক্তি নামুক আমার ছন্দে
যেমন মুক্তি পায় মেঘ বর্ষণে
যেমন মুক্তি পায় ময়ূর কেকারবে
যেমন মুক্তি পায় পর্ব্বত নদীতে
তেমনি নামুক মুক্তি আমার ছন্দে।

গুরু গুরু রবে কাঁপুক এই মেদিনী
এই অলস, মন্থর, পুরাতন মেদিনী !

আমাকে ঘিরে রয়েছে এই তমস্বিনী,
রক্তে, কঙ্কালে, মিথ্যায়, সত্যে
অবিবেচনায়, ধূলিতে—
আনো তুমি ঝড়, সারথি,
শন্ শন্ ক'রে আবর্ত্তিত হোক্
তোমার গতির চাবুক
তোলো তুমি ঝড়, কর্ণধার!

কি আনন্দ আমার
কি দুঃসহ দুর্ব্বার তোমার গতি—
কাঠুরিয়া, জড়তার অরণ্যে হানো তোমার অমোঘ কুঠার,
ধরো তোমার চাকা,
অদ্ভুত একটা শব্দ আসুক আমার মনে
আমার শরীরে,
তারপরে ধূলায় ধূমে
আর অজস্র বাধায় প্রহত হ'য়ে হ'য়ে
শাণিত প্রখর হোক্ তোমার বেগ,
রেলের লাইন যেমন চোখের সামনে

দেখ্‌তে দেখ্‌তে যায় মিলিয়ে
রৌদ্রে শীতে কুয়াসায়
জমাট অশ্রুর বাষ্পে
যেমন দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাই মিলিয়ে,—
যায় মিলিয়ে,
তেমনি ছুটুক তোমার রথ,
গুরুগুরু রবে কাঁপুক এই মেদিনী
এই অলস, মন্থর, পুরাতন মেদিনী।

*

হে মহাসারথি
গতিতে তোমার আনো বিদ্যুৎ
হও তুমি বজ্রধর, বৃত্রহা
মন্থর, বিষবাষ্পময় জড়ত্বের মেঘের 'পরে'
হানো তোমার উদ্যত বজ্র!
হে বৃত্রহা,
হানো তোমার কর্ম্মের
অশ্রান্ত বারিবর্ষণে চেতনার অগ্নিময়ী কশা,

হে মহাসারথি,
ভেবেছি কতোদিন
আন্‌ব তোমাকে মনে,
তোমার সঙ্গে মিশে যা'ব আমি
তোমার অগ্নিদীপ্ত দেহে
হে সারথি,
ভেবেছি কতোদিন
নির্জ্জন অলস মনের ভাবনা,
বাধাকে করতে পারি না জয়,
হ'তে পারি না মুহূর্ত্ত জয়ী
তোমার মতন ভাসা'তে পারি না
আমার দেহ, আমার চেতনা
কর্ম্মের বিদ্যুৎ-প্রবাহে,
তাই উদ্বোধন করি তোমাকে
হে সারথি
গতিতে তোমার আনো বিদ্যুৎ
হও তুমি বজ্রধর, বৃত্রহা
মৃত্যু-স্তম্ভিত কালো মেঘের স্তরে
হানো তোমার অগ্নিময়ী কশা!

হে সারথি
স্থির, গম্ভীর নতদৃষ্টিতে চালাও তোমার রথ।
পেশীকঠিন শিরাল হস্তে ধরো তোমার চক্র,
একটা অদ্ভুত রহস্য আনো তোমার মুখে,
তারপর উঠুক একটা গুরুগুরু বজ্রনির্ঘোষ,
মাঝে মাঝে শঙ্খের শব্দে চকিত করো জনারণ্য
চকিত করো তোমার পাঞ্চজন্যের শব্দে
স্তম্ভিত মহাভারতের জনারণ্য।
হে মহাসারথি,
বলো, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ!'

কত বাণী, কত শব্দ আর গতির স্রোত বেয়ে
এলাম তোমার পাশে, হে মহাসারথি,
তোমার প্রচণ্ড বেগের পাশে পাশে
দূর আকাশে শুধু একটি
স্নিগ্ধ নীলাঞ্জন রেখা এঁকে দিও,

সেটি হ'বে আমার ললাটের তিলক
তোমার আশীর্ব্বাদ।
কোনোদিন তোমার রহস্যময় মুখের দিকে তাকিয়ে
তোমার গতিনিয়ন্ত্রী দেহ
আর স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের দিকে তাকিয়ে
তোমার ধূলি-উড়ানো ধ্বনিত-পথ রথের মধ্যে ব'সে
আমাকে ভাবতে দিয়ো
ঐ নীলাঞ্জনরেখার দিকে চেয়ে
ভাবতে দিয়ো
রইবে না যখন জড়ত্ব
রইবে না যখন অবসর
যখন বিদ্যুৎবর্ষী কর্ম্মের অক্লান্তচক্র ঘুরবে,
তখন ঐ দিকে তাকিয়ে
ভাবতে দিয়ো
হে মহাসারথি!

কোনো কম্‌রেডের বিবাহে

বিষ্ণু দে

নব অলকার স্বপ্নমায়া
উল্কা ছড়ায় তারায় তারায়।
রচনায় তবু পড়ে'তো ছায়া—
হৃদয় যদিই তোমাকে হারায়!

চোখ মেলে দেখি ভাঙা ও গড়া,
মেলাই মেলায় আপন স্বর।
আগত পুলকে ক্রমেই চড়া
মিলিত কণ্ঠে প্রাকার চুর্।

এল কি সিদ্ধি! খোলে কি দ্বার!
জনতাদীপ্ত চলি সবল।
তবু দ্বিধা, ভ্রূবী অন্ধকার
যদি দূরে যাও, কালের ছল!

নব অলকার স্বপ্নমায়া
জানি খুলে' দেবে আলোক দ্বার।
তবু পাশে চাই এ প্রিয় কায়া,
হৃদর আমার! হৃদয় যার।

বিদায়

বিষ্ণু দে

বিদায়! তাহলে ধবলগিরির মৌনে বিদায়
হতাশ বাহুর শেষ পাণ্ডুর অঙ্গীকারে।
রক্তিম চূড়া অস্তরবির শেষ মদিরায়
কঠোর প্রমাদে হৃদয় বিঁধায়। অশ্রুধারে
বিদায়! তন্বী! পৃথুল পৃথিবী তোমাকে ডাকে
সভ্য লোভের জটিল স্বার্থে, হে বন্দিনী!
কারো দোষ নেই জানি, অসহায় দুষ্‌ব কাকে?
তুমি তো জেনেছ আমাকে, আমিও তোমাকে চিনি।
আমাদের পথ দক্ষিণে বামে ত্রিশূল টানে,
তুমি ভেসে যাবে সরল মেদের সচ্ছলতায়।
তবুও তোমাকে এ তুষারহ্রদ আপন জানে
চিরকাল, জেনো, অতল হৃদয়ে নিথর কথায়।

"সৌখীনতায় হারালুম জীবন"—সব চেয়ে উঁচু মিনারের গান : র‍্যাঁবো

বিষ্ণু দে

থেকে থেকে দেয় মুখর বিরসপ্রহরে হানা
ধূসর দিনের রেশারেশি আর নির্জনতা,
কর্মকাণ্ডে বিবশ সহরে—মানে না মানা;
রেখে যায় খর অনিদ্রাজীবী নির্মমতা।

প্রত্যহ হানে অত্যন্ত যে অভাব রোজ
প্রত্যহ সে তো চলে অনন্তকাল ধ'রেই।
মূর্খ মানব! নির্বোধ মরস্বভাব! ভোজ-
বাজির আশায় ঝোলে, অরণ্যে ডাল ধ'রেই।

জাগে অনর্থ প্রত্যহ! চোখে নিদ্রা নেই!
কালের কেরানি! টোকে যতো ছোটোখাটো বাকি।
সহৃদয়ও তাই ভুল বোঝে, আর ছিদ্র নেই,
পুনর্মূষিক বুদ্ধির পথে তাই ফাঁকি।

বাইরে কোথায় মেলাবে তোমার বেসুর স্বর,
হে নিঃসঙ্গ শামুক! তোমার কুটিল মন।
কথা শোনো, করো ঘরকে বাহির, আপন পর
হৃদয়কে করো আকাশের নীলে উন্মীলন,

যে আকাশে চলে প্রাজ্ঞ বটের নীলবিহার,
শঙ্খচিলের মিছিল ওড়ে যে আকাশ জুড়ে,
সূর্য্যমুখী যে শূন্যে পেতেছে হৃদয় তার,
নক্ষত্রের আবেগে পথের ধূলাও ওড়ে,

বৈশাখী সেই ঝড়ের আকাশে কান পাতো আর
বিরাট শূন্যে মৈত্রীর সুরে মেলাও স্বর।
দুহাতে হৃদয় মেলে দাও, ওরে ভীরু গোঁয়ার!
বিনয়ের জালে আঁধার তোমার শূন্যঘর,

অনিদ্রাঘেঁষা স্বপ্নসাগর কিনারে ঘর,
আকাশে বন্দী সে গজমোতির মিনারে ঘর,
বৃথাই লজ্জা, বৃথা ভয়, আজ স্বয়ম্বর!
বারণাবতের ছদ্ম ছিন্ন, দগ্ধ দীর্ণ, হে বর্বর!

সুমেরীয়

জীবনানন্দ দাশ

ক্রমে ধূলো উড়ে যায় বিকেলের অন্তহীন পাটল আকাশে ;
অস্ফুট বৃষ্টির গন্ধ ;—প্রকাণ্ড ময়দান জুড়ে এক পাল ভেড়া
নিরুত্তর ছবির মতন স্পষ্ট ;
সূর্য্যের তির্য্যক গতি
কৃষ্ণাভ মেঘের থেকে তাহাদের শরীরের পরে
সুমেরীয় বল্লমের মত যেন প্রাগৈতিহাসিক তর্কে নড়ে।

অদ্ভুত অমল আলো একবার জ্ব'লে ওঠে চারিদিকে
সন্ধ্যা আসিবার আগে।
য়ুনানী যুগের স্তম্ভ—মাঠের বাদামী ঘাস—নদী—
ঢের মজুরের মুখ—মনে হয়—সুমেরীয়।
ইহাদের ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে তবে বহুদিন।
কপিশ মাটির গর্ভ খুঁড়িলেই অখণ্ড প্রেমিক প্যারাফিন
এরা সব। এই ভৌতিক আলো চাই নাক'—আমি চাই ক্ষেম।
ইহাদের অরুন্তুদ উৎস তবু সুমেরীয় প্রেম।

মৃত্যু

জীবনানন্দ দাশ

হাড়ের ভিতর দিয়ে যারা শীত বোধ করে
মাঘ রাতে ;—তাহারা দুপুরে ব'সে শহরের গ্রিলে
মৃত্যু অনুভব করে আরো গাঢ়—পীন।
রূপসীও মরণকে চেনে
মুকুরের অই পিঠে—পারদের মত যেন
নিরুত্তর হয়ে আছে। অথবা উড্ডীন
এক আধটি দৈত্যাকৃতি দেখা যায়
জনতারে চালাতেছে বিকালের বিরাট সভায় ;
নিদারুণ বিশ্বাসের মত যেন স্থির ;
মৃত্যু নাই—জানে তারা ;—তবুও তাদের মুখ
চকিত আলোয় পূর্ণ ফোটোগ্রাফ থেকে
উঠে এসে ভীত হয়
নিজেদের গ্লানিহীন পরিণতি দেখে।

আমিষাশী তরবার

জীবনানন্দ দাশ

স্মৃতিই মৃত্যুর মত ;—ডাকিতেছে প্রতিধ্বনি গম্ভীর আহ্বানে
ভোরের ভিখিরী তাহা সূর্য্যের দিকে চেয়ে বোঝে।
উঁচু মঞ্চে বিধাতার পরিত্যক্ত সন্তানেরা জানে ;
পাণ্ডুলিপি, যব আর সোনার ভিতরে তারা খোঁজে

অবহিত প্রতীককে। কে দিয়েছে স্মৃতি এই বিকীর্ণ হৃদয়ে :
কোনো কিছু অবলুপ্ত পিপাসার অন্ত্যজ ধারণা ?
বৈশালীর থেকে বায়ু জাহাজের মুখে আজো বহে ;
প্রাকৃত নাবিকাধমও মাস্তুলের পীঠ ঘেঁষে দুপুরের রৌদ্রে অন্যমনা

চেয়ে থাকে। চারিদিকে নবীন যদুর বংশ ধ্বংসে
কেবলি পড়িতে আছে ; সঙ্গীতের নতুনত্ব সংক্রামক ধুয়া
নষ্ট ক'রে দিয়ে যায় ;—
স্মৃতির ভিতর থেকে জন্ম লয় এই সব গভীর অসূয়া।

জেনেছে বরুণ, অগ্নি, নরনারী : কর্ম্মক্ষম জীবনের শেষে
এক পাল ভেড়া লয়ে হেমন্তের মাঠে
শান্তি সারাৎসার নয় ;—আলো জেলে শকুনি মামার সাথে হেসে
নগরীর রাত্রি চলে—আমিষাশী তরবার হয়ে তার প্রভাতকে কাটে।

মৃত্যুবাণ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আমার রক্তে আজ কালো রাত্রির ছায়া হানা দিল।

কত কাশবন
আর শস্য-ভরা সোনার মাঠে জলন্ত যুবতী সন্ধ্যা।
শরতের মাঠে সবুজ প্রজাপতি,
চাঞ্চল্যে তীব্র আর শুদ্ধতায় সমাহিত।

শক্ত মাটিতে এলো রক্তের ধারালো ধারা ;
রক্ত সন্ধ্যায়।

আমি স্বপ্নে দেখেছি সেই হঠাৎ-আসা কাশফুল
যারা হঠাৎ মিলিয়ে যায় হেমন্তের শিশিরে।
বসন্তের অদ্ভুত রাত্রিরা ফুলের পাপড়ির মত কাঁপে,
আমি স্বপ্ন দেখেছি।

প্রদীপ মরে যায়, উৎসবের রাত্রিরা জীর্ণ,
হেমন্তের যুবতী সন্ধ্যারা আজ অপরূপ সজ্জায় :
শীতের শিশিরের তীর তাদের দিকে উদ্যত।

আমি তো শুনেছি শুকনো ঘাসের দীর্ঘশ্বাস
দেখেছি তো বন্ধ্যা মাটির নীরব ব্যাকুলতা
তবুও নির্ব্বোধ
নির্ব্বোধ
নির্ব্বোধ
তবুও তোমার হাতে আমার মৃত্যুবাণ।

আমার রক্তে আজ কালো রাত্রির ছায়া হানা দিল।

মাকড়সা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঝাঁঝাঁলো রোদে এখন শীতের ঘাসের ঘ্রাণ
দুরন্ত প্রজাপতির ভিড়—ফাল্গুন কত দূরে ?
শুকনো ফণিমনসায় মাকড়সারা জাল বোনে
আর রোদ চমকায়
ঝাঁঝাঁলো রোদ ঘাসের ঘ্রাণে-ভরা।

দ্বিপ্রহরের হৃৎপিণ্ড চম্‌কে ওঠে।
পশ্চিমের বন্ধ্যা পাহাড় ডিঙিয়ে ঝুপঝুপ্‌ ক'রে ছায়ারা এলো
মৃত দিনের প্রেত ছায়া
দীর্ঘ দীর্ঘ পা ফেলে।

মন্থর : দীর্ঘ।

ওগো মাকড়সা ! জাল বোনা হল শেষ ?
নিজেকে ক্ষয় ক'রে যে রূপোর জাল বিছোলে
কটা শিকার ধরা পড়ল ?
সবুজ আর রূপোর কত পাতলা পাখনা ?

এখন রাত্রি আস্‌বে।
যে ঝাঁঝালো রোদ সারা দুপুর ধ'রে মাঠে জমিয়েছে
মাঝরাত পর্য্যন্ত তা ভাঙিয়ে ছড়াবে সে উত্তাপ,
তারপর দেউলিয়া।
শীতের ঘাসের ঘ্রাণ রাতের শিশিরে ভিজে যাবে :
রাত্রির হৃৎপিণ্ডে ঘা দেবে আকাশের অবাক শিশির।

তোমার দেহের রোমকূপে কত পুঞ্জিত বসন্তের দুরন্ত আবেগ ?
তোমার স্মৃতিতে কত বর্ষা-রাত্রির ভিজে অন্ধকারের ইতিহাস ?
আর কত ভাঙা কবরীর দুর্জ্জয় জোয়ার ?

তুমি কি চম্‌কে উঠেছিলে
এই দ্বিপ্রহরের হৃৎপিণ্ডের মত, প্রজাপতির ডানার আঘাতে ?
বুনেছিলে কি জাল ফণিমনসার ঝাড়ে
বোকা মাকড়সার মত ?
নিজেকে অনর্থক ক্ষয় ক'রে রূপোর দীর্ঘ জটিল জাল।

লেকে, সন্ধ্যায়

(শ্রীরণজিৎ ঘোষকে)

হরপ্রসাদ মিত্র

নতুন হ্রদের জলে ছায়া ফেলে কুটিল রেখায়,
সহর-সীমানা ছেড়ে ট্রামের চাকায়,
উধাও চলার শেষে আবার এসেছে রাঙা চাঁদ।
লেক হ'লো লাল মাটি বাঁধ।

টিক্‌টিক্ ঘাট পায়ে
ক্রমিকীট চ'লেছে সময়,
রেডিয়ম-ডায়ালের
চোখে আজ মৃত সংশয়।
পিছল পিচের পথে
গ্যাস জলে,—মোটর-বিহার।
উন্নত বুকে এলো
তৃষিত চাতক শনিবার।
রাঙা চাঁদ এলো ফের
দূরে রাত নিথর ঘুমায়,
চুপি-চুপি, বারে-বারে

প্রহরী তারারা আসে যায়।
হরিণী-নয়ন যেন—
মনে পড়ে দেখেছি কোথায়
কালীঘাটে, কানপুরে,
অথবা সে হবে মাদুরায়!
প'ড়েছ কি চারুপাঠ?
এ-বিষম যৌবন কাল।
কানে-কানে দুটি কথা
শুনে গেল মণিলতা পাল।

জীবনে অনেক দিন, কে তার হিসাব রাখে বলো?
হাজার তিমির পিঠে,—পিচ্ছিল পথে যাই চলো।
সিগারেট হ'লো ছাই, ঘেমে ওঠে মালতীর মুখ;
এলানো হাতের পাশে ঘুমন্ত ধুক্-ধুক্ বুক।
হালকা চুলের গুছি নামে দুই নিষ্প্রভ গালে,
শার্সি পেরিয়ে এলো ফিকে রোদ সেদিন বিকালে।
ট্রাম-ট্রাম-ট্রাম।
মর্ত্য মরেই যদি, অক্ষয় স্বর্গের থাম।
জনতার জটলায়,

সিনেমায় আলোছায়
পৃথিবী তো নন্দন-ধাম।
কাগজে রটায় শুধু
অর্দ্ধেক হ'লো ধূধূ,
অর্দ্ধেক শঙ্কিত প্রাণ
রেডিওতে খাড়া রাখি কান।
কোথায় হারালো ঘুম ম্যাজিনো-র লাইনে
লাল ফানুসের শোভাযাত্রা
চীনের সহর দেখে নিষ্পনী বিভীষিকা,
বাড়ে হেথা করুণার মাত্রা।

* * * *

মঞ্জুলী নন্দী কি?—জাফ্‌রানী শাড়ী ঐ,
সঙ্গে কে?—অবধূত সাঁত্‌রা!

জীবনে অনেক দিন, হায় মর পৃথিবীর প্রেম!
মাঝে-মাঝে ছুটি দেয় নাগরিক শবর মদন।
লাল নিশানের ডাক, কুমারী পৃথিবী বহুদূর,
সবুজ পাইন-ছায়া চোখে তার নেমেছে গভীর।
খসখস-সুরভিতে মসী-ম্লান ঝিমায় দুপুর
গহন ঘুমের হ্রদে নামে চাঁদ কিশোর কবির।

মিনার-বাসী

সুরেশচন্দ্র সরকার

আকাশে মলিন আলো, সন্ধ্যার ম্লান ;
নীল ছায়ে ছায়ানট বাজে।
শ্বেত তুষারের মত প্রমোদ বিতান ;
তারি তলে বীণাতারে উঠিছে কী তান !
কম্প্র সে রবে মোর কম্পিত প্রাণ
মিলায় দিগন্তের মাঝে।

মুখর স্রোতের 'পরে উদাসীনতায়
শান্ত মিনার একা জাগে।
সে বিজন ভবনের কারুকৃত কায়
চঞ্চল ছায়াছবি দেখা দিয়ে যায় ;
নাচে নানা ভঙ্গিতে প্রদোষ-মায়ায়
চোখে মম প্রেতসম লাগে।

হেথা বসি' রচি গান আপনার মনে
লঘুভার, অর্থবিহীন।
বহু নিচে চেয়ে দেখি ক্রুর গরজনে
নাচে নদী নিরবধি অথির পবনে ;

আনে তাহা দু'নয়নে জাগর স্বপনে
নির্বোধ বাণীছায়া ক্ষীণ।

মাঝে মাঝে আঁখি ঢুলে মোহতন্দ্রায়,
ভিড় করে নানান স্বপন।
কভু দেখি সর্প সে ময়ূর পাখায়
কভু নীড়, নির্বিষ সুখনিদ্রায় ;
ব্যাঘ্র ও শশকের মিলনমেলায়
নিখিলের সজল নয়ন।

কভু দেখি মেঘে ছায় প্রদোষ আকাশ,
নাচে নদী নিষ্ঠুর সুখে ;
দূর বনমর্মর চৈত্র-উদাস
ক্রমে যেন কাছে আসে প্রলয়োচ্ছ্বাস,
সংশপ্তকদল মৃত্যুনিরাশ
চূর্ণিবে যা পাবে সমুখে।

জেগে উঠে দেখি নীল নীরদ কিনার
কনকিত কিরণপ্রভায় ;
তেমনি দাঁড়ায়ে আছে পৃথিবীসীমার
পরপারে হেথা মোর শান্ত মিনার ;
কম্পিত শুনি পুন কল্প বীণার
প্রেতস্বর প্রদোষছায়ায়।

বন্ধন

ফররুখ আহ্‌মদ

যে সন্ধ্যামণির রূপ বেলাশেষে নিভৃত রহসি
ওঠে ফুটি' অগ্নিবর্ণ অঙ্গনের ধূসর ছায়ায়
তারে চেনে হংসদল, তারে চেনে বসুধা উষসী।
নিখিলের সাথে যারা বাঁধা আছে নিবিড় মায়ায়—
সেই বিহঙ্গমদল উড়ে যায় যখন আকাশে
কত স্পর্শহীন রঙে গোধূলির ধূসর আলোতে
পক্ষপুট বিস্তারিয়া কখনো বা দুরন্ত বাতাসে
ভেসে যায় অবহেলে পশ্চিমের ঝোড়ো-হাওয়া-স্রোতে,

তখন বুঝিতে পারে তাহাদের ভ্রাম্যমাণ মন
বাঁধা আছে মৃত্তিকায় ; শ্যামস্পর্শে তাহারা আবার
ডুবে যাবে—আলোর বিহঙ্গ-শিশু ঘুমাবে যখন
মাতা তিমিরের বুকে। মনে হয় আজ বারবার
বসুধার প্রাণছন্দ আমারে করেছে অধিকার,
দিয়েছে শোণিতে মোর জীবনের নিবিড় বন্ধন।

স্মরণ

ফররুখ আহ্‌মদ

সহজ সত্যের মত কতবার মৃত্যু এল, আর
কতবার মৃত্যু গেল চ'লে।—কত ফুল ঘুমাল ধূলায়,
কত ফুলে গাঁথা হ'ল বাসরশয্যার উপহার।
মৃত্যু এল কত গৃহে। ভেঙে দিয়ে পুরানো কুলায়
মৃত্যু এল নতুনের বুকে। তুমি যারে ভালোবাসো
মৃত্যু তার বুকে বসি' পান করে সব ভালোবাসা।
এও ত' সহজ সত্য। কত ভোলো আর কত হাসো,
তোমার বুকের কোণে ঘুমাল যে তার শেষ আশা

সমাধির বুকে ঢাকো। দিন আসে—সে দিন ফুরায়।
তবু তিমিরের বুকে তারকা-স্মরণ-স্বয়ম্বর
—বিগত দিনের স্মৃতি। হারানো সুরের বীথিকায়
গানের সন্ধান করো, ভেঙে যায় সুরের নির্ভর
তবুও স্মরণে জাগে। কত গান আসে আর যায়,
কত পথ-ভোলা গান রেখে যায় অটুট স্বাক্ষর।

সামুদ্রিক

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সামুদ্রিক শ্মশান থেকে সুগুপ্ত দীর্ঘশ্বাস
বাণিজ্যবায়ুতে বেদনার স্পর্শ আঁকে।
দক্ষিণের সুনীল লেগুন
প্রপেলারের পদপীড়নে আহত হোলো,
তালকুঞ্জের শিয়রের আকাশে
ধূসর ধূম্র বিষণ্ণ কালিমা ছড়ায়।
নবজাত বন্দরে বণিকভোজের সমারোহ,
বিয়র আর সিল্ক আর সস্তা সিগারেট
জোগান দিল অসচ্ছল গণিকাবৃত্তির খেসারত।
সবুজ বনে হায়েনার হামাগুড়ি
সোনার ফুলে মৃত্যু হানে কৃপণ কীট।

এখানে, ফণিমনসার জঙ্গলে পথ খোঁজে বিফল দিন।
প্রস্তর-কঠিন চিত্তে
মৃত তারকার অন্ধ চোখের
বন্ধ্যা নিয়তির কঙ্কাল হাতের হিম আশীর্বাদ।

বিলাসী বসন্ত সন্ধ্যায়,
সঙ্কীর্ণ ফ্ল্যাটের হলদে আলোয়
কারখানার ধোঁয়ার পারের
বিভ্রান্ত চক্রবাল থেকে ভেসে আসা
হাওয়াই-এর সঙ্গীত বিশীর্ণ রক্তে চঞ্চলতা আনে,
রুদ্ধশ্বাস প্রেক্ষাগৃহে
বিনষ্ট যৌবনে হাত বোলায় টাহিটির মেয়ে।

একটা প্রেমের গান

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কালসর্পের ক্রূর ফণা ছিল একঁদিন তব চোখে
আজকে তোমার অজগর দেহে দেখি
সে সাপ হয়েছে মৃত ।

জীবন আমার অবিরাম ক্ষয়ে গেছে
বিড়ির দোকানে শুক্‌নো দড়ির মত :
দীর্ঘ শুকনো দড়ি ।

আজ শুধু আছে মশাদের গুঞ্জন
মশাদের দংশন
অতীত স্মৃতির মত ।

তোমার প্রেমের গান
মনে হয় যেন গ্রীষ্মদুপুরে দূরে ফেরিওলা ডাকে
দুপুর যে নিঃঝুম ।

একমুঠো ধূলো ছুঁড়েছি তোমার দিকে
(একমুঠো ধূলো কত রহস্য জানে ?)
স্বপ্ন ও মায়া ঠেকেছে মতিভ্রমে
মৃত্যুর সাড়া পাও ?

শক্তিহারা

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধদেব বসুকে)

আবুল হোসেন

আমি বাংলা দেশের ছেলে,
কটা মাটির কালো বুকে বেড়াই হেসে খেলে ।
মিতালী মোর শ্যামল ঘাসে,
অশথ বট শিমূল শিশু কদম কাশে ।
খাঁ খাঁ করা কাটফাটান রোদ্দুরে মাঠ জলতে যখন থাকে,
বাড়বানল ওঠে পথের বাঁকে.
আমি তখন খালি মাথায় যেয়ে
ঘর্ম্মে আসি নেয়ে ।
সূর্য্য যখন ক্লান্ত হ'য়ে দিনের শেষে
পশ্চিমের সাগরজলে ডুবলো হেসে
কাজল দীঘির কালো জলে লাগলো হিমের হাওয়া,
বাঁশের ঝাড়ে ঝিলিমিলি রঙের টোপর ছাওয়া,
বেতস বনে ওঠে ডেকে ঝিঁঝিঁ,
সরগরম সে হাটের পথটি হিমে ওঠে ভিজি ;
আমি তখন মিষ্টি মধুর হাওয়ায়,

চুপটি ক'রে শুয়ে একা খড়ের ছাওয়া দাওয়ায়,
আনমনেতে রই যে চেয়ে দূর আকাশের পানে ;
নয়ত কখন এলিয়ে পড়ি দারুণ ঘুমের টানে ;
দুই পাশে মোর জোনাকিরা বেড়ায় আলো জ্বেলে।
আমি যে এই বাংলা দেশের ছেলে।

রবি বাবু, খুঁজে দেখ তোমার যত পুঁথি ও পাত্তাড়ি
আমার সাথে তোমার জন্ম আড়ি ;
তুমি যাদের আন্‌লে ধরে
ভালো লাগে, আনন্দ পাই, তাদের কথা পড়ে ;
অবাক হই যে বিস্ময়েতে অতি,
চোখে মুখে ছিট্‌কে পড়ে প্রশংসা-আরতি ;
কিন্তু তাদের কাউকে চিনি না যে
আমার সাথে নাইক তাদের একটুও মিল কাজে কথায় সাজে।
অনেক দূরে তারা ;
বোশেখী মেঘ ঘূর্ণি পারা,
দিক হ'তে কোন দিগন্তরে ছুটল তাদের রথ,
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে লোকে লোকে ফেলি সুরের পথ,
সীমাবিহীন সাগর পারে ভাসিয়ে দিল তরী,

নিরুদ্দেশের উদ্দেশেতে রইল যে হাল ধরি,
থামবে কোথায় কোন দেশে কে জানে,
নাম-না-জানা কোন্ ঘাটে কোন্‌খানে।
শুনতে শুনতে হৃদয় ওঠে কেঁপে,
বুকটা তখন দেখত যদি অমনি কেহ মেপে !
কিন্তু সে ত আমি যে নই আমার সাথে কোথাও নাহি মেলে,
আমি কেবল বাংলা দেশের ছেলে।

আলাওলের দিনগুলি আর আজকের এই কাল,
তফাৎ মাঝে আকাশ ও পাতাল।
অনেক কথা এল উঠে নূতন কালের রথে,
অনেক কথা হারিয়ে গেল অন্ধকারের পথে।
বদলে গেল চলার ছন্দ বলার ছন্দ সব,
বদলেছে আজ সুখদুঃখ কান্নাহাসির রব।
ছড়িয়ে পড়ে নূতন কত বাণী, নবীন আলো,
গত কালের অনেক কিছু যায় না দেখা, কালো শুধু কালো।

পিছন পানে ফেরাতে যেই গেলাম একটু চোখ,
উথলে হঠাৎ উঠল অনেক দিনের কথার শোক :

একদা এক রাজপুত্তুর কোটাল পুত্তুর সাথে,
পক্ষীরাজের পৃষ্ঠে উঠে
খটমটিয়ে চলল ছুটে
সুদূর নীলিমাতে।
পায়ের তলায় দেশান্তরের কত না পথ দিগন্তে বিলীন,
নাম-না-জানা রাজা ও তার রাজ্য সে অচিন ;
সাত সুমুদ্দুর পারে কোথায় রাজকুমারী জাগে,
রাজকুমারের গভীর অনুরাগে।
এই তো সেদিন স্পষ্ট মনে আছে
দক্ষিণের ঘরের কাছে
দাওয়ায় বসে রাতে—
অন্ধকারে নিশুত চারিধার,
মাথার ওপর অসীম আকাশ, চাউনি তারকার—
শুনেছি সব বুড়ীর কাছে গভীর নিরালাতে।
অথবা কোন গ্রামে সাঁঝে উঠল বেজে ঢাক কাঁসারি ঢোল,
সারিগানের তালে তালে তবলা তোলে বোল,
ছেলেরা সব নেচে বেড়ায় হাতেতে হাত রাখি,
চারপাশেতে ঘুরতে থাকে বৃদ্ধজনের আঁখি।

নয়ত খা কোন চণ্ডীমণ্ডপেরি আসর হতে আসছে সুর,
গীতাপাঠের ধ্বনি বা রাম লক্ষ্মণ হয় পার যে সমুদ্দুর ;
নিশুত রাতে কোথায় ব'সে মুন্সি সাহেব কোরান আব্জিদ পড়ে,
কেঁপে কেঁপে উঠছে সে সুর সারা গ্রামের পরে।
মনে পড়ছে সব :
অনেক কালের স্মৃতি মাখা অনেক কলরব।

আজকে যারা বেড়ায় ফোনে টালিগঞ্জে ডেকে,
বিকেল হ'তেই ছোটে সবাই বালিগঞ্জের লেকে,
নীল রুমালটা টাইএর মত গলায় বেঁধে নিয়ে,
গিলে করা ফুর্‌ফুরে পাঞ্জাবীটা গায় দিয়ে,
হুহু কোরে বিনা কাজে ট্যাক্সি চেপে ঘোরে,
বারে বারে দাঁড়ায় এসে চৌরঙ্গীর মোড়ে,
চোখে মুখে কথার পঙ্গপাল,
ঝাঁকে ঝাঁকে বসে যেন রইল ফেলে জাল,
হাসতে গিয়ে একটুখানি কাশি,
লম্বা কোঁচায় জড়িয়ে নেওয়া পথের ধূলিরাশি ;
নূতন দিনের নূতন আলোয় যারা
হ'ল আত্মহারা,

তারাও তো সব বাংলা দেশের ছেলে ;
আলাওল আর রবিবাবু এদের গেছে ফেলে ?

আলাওলের কাল কোথা আর কোথায় আমার দিন,
কোনখানেতে রইল মিলের চিন ?
কোথায় বা সে দুপুরবেলা কদমতলায় ব'সে
তাস পেটান ক'সে,
কোথায় বা এই কলেজ কারায় ফ্যানের তলায় চুপটি ক'রে শোনা
অধ্যাপকের বক্তৃতা, নয় চোখটি বুজে ঘড়ির মিনিট গোনা।

মনে পড়ল যে কথাটি রেখে এলাম ফেলে :
নেহাৎ আমি বাংলা দেশের ছেলে।

আমি যে ভাই নেহাত সাদাসিধে,
আমায় নিয়ে কাব্য রচার অনেক অসুবিধে।
একবারে নীরস গদ্যখানি,
চারপাশেতে আর সবারই মত নিশাস টানি।
এই যে কুচো গদা পদা হাঁদা গঙ্গারাম
এদের মতই একটা কিছু নাম।

দু এক কথা লিখতে গেলে কলম ভাঙে আজো,
বারে বারে বদলে আসা হয় নাক' যে সাজও।
জন্ম থেকেই এমনি ক'রে কাটল এতকাল,
টলোমলো ঘায়েল তরীর হাল ;
বিশ্বকর্ম্মা গড়তে গিয়ে ভুল করেছে কোথায় একটুখানি,
আজো চলছে ঘায়েল চাকা বাইক সম তার সে টলমলানি।
অনেক হ'ল অদল বদল পিছে অনেক কাল,
তবু সোজা হ'ল না আর হাল।
রঙিন স্বপ্ন জড়িয়ে যখন আসেনিক নিদ্রাবিহীন রাতে,
ঊর্দ্ধ পানে চাইনি আঁখি পাতে,
ওঠেনি এ শরীর কেঁপে উতল পবন সনে,
বুক-ভাঙা সে অস্ফুট ক্রন্দনে,
চায়নিক পার হতে মরু অচিন সীমাহীন
শিকল-ভাঙা আরব বেদুঈন ;
সেদিন ছিল মৌন বুকের বীণা,
হাত বাড়িয়ে দেখতে কেহ চাইত না এ আকাশটা যে
আকাশ কিনা ;
শুষ্ক অলস নিদ্রাভরা সেদিন ছিল শুধু
অজানা আর অদেখার সে মরু করে ধূ ধূ।

আজকে আবার ভাঙল যখন ঘুম,
মুখের পরে লাগলো এসে নূতন আলোর ধূম,
উঠল জেগে ভীম অজগর রোষে,
বিদ্রোহেরি অগ্নিবীণা গর্জ্জে প্রতি কোষে,
অসিটা তার হঠাৎ কোথা হারিয়ে গেল আজ ?
কোথায় বা শূল কোথায় বর্ম্ম সাজ ?
চেতন বুকের বীণা উঠল স্বরে স্বরে ভরি,
ছড় চালাবার শক্তি কেবল নিয়েছে কে হরি'।

আলাওলের দিনগুলি আর রবিবাবুর দিন,
কালের কারুশিল্প উদাসীন,
রাখল এসে হাতেতে হাত চিনে
আজকের এই দিনে,
সেদিনকার সে স্বপ্নহারা আর আজিকার শক্তিহারা
এক সাথে সব মেলে,
আটপৌরে বাংলাদেশের ছেলে !

সমুদ্র

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কতো কল্পিত স্বপ্ন-সমুদ্র
শান্ত কখনো রুদ্র
পল্লবিত হাওয়ার মর্ম্মর
নিঃসঙ্গ প্রবাল-দ্বীপ আর সিন্ধুশকুনের স্বর
ফেঁসে-যাওয়া জাহাজ-মাস্তুল
রোদে-নাওয়া বালু-উপকূল।

আমার কাছে চেতন স্বপ্ন নয়—
সমুদ্র আমার অবচেতন মন।
আমার স্নায়ু-শিরায় মিশিয়ে আছে
নোনা জলের ছিটে।
ভাবি না তার হিংস্রতা, উচ্ছ্বসিত আবেগে—
শুধু জানি তাকে...

যার রূপ নেই, যার রঙ নেই
সেই সমুদ্র আমার।

সে স্থাণু পাহাড় নয়, স্মিতচপল নদী নয়,
সে শুধু পুরাণের।
যার অথৈ জল বিপুল পৃথিবীকে
ছাপিয়ে যায়, ডুবিয়ে দেয়—
অনাদি জীবের প্রথম ও শেষ শয্যা।

যার জন্ম জীবজন্মেরও আগে
তারই মাঝে মরণ যেন আসে।
মরণ যেন হয়—অন্ধকূপে নয়
চার দেয়ালের কৃপণ মুঠিঝরা
বিবনীলের ঝল্‌কানিতে নয়।

খোলা আকাশ-নীচে
জাহাজ যেন দোলে
প্রখর সূর্য্য আড়াল করে ঢেকে
ঢেউয়ের দোলায় চাঁদ সরিয়ে রেখে
মরণ যেন আসে বিনা পটভূমিকায়…

লাগুক মুখে নোনা জলের ছিটে—
আমার দেহের রক্তকণিকার
তোমার মুখের প্রথম আর্দ্রতার
মধুর স্বাদ নিয়ে।

তারপর ছম্‌ছমে ঘুম
অচিন মায়াপুরীতে
শিয়রে তোমার ঘন অতল কোল
পায়ের তলায় ক্লান্ত সাগর-দোল।

রথযাত্রা

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

তুমি যেন কোন রথের মেলার মুখ
এলোমেলো ঘোরো নাগরদোলার সাথে ;
কাঠের পুতুল—ওঠাপড়াহীন বুক,
মেডুসা-কঠিন দৃষ্টির শাপ হাতে।
ঘুরে ফিরে তাই ভুলে যাই কেন খুঁজি,
অভিধান খুঁড়ি, খনি বুঝি আছে নিচে।
এতো শালীনতা, এতো বয়সের পুঁজি,
শুধু পাড়া ঘোরা—সব হল বুঝি মিছে।
মুখোস ছাড়ি না, তবু মুখে বলি আহা,
রসবোধ আছে তাই মানুষেরা বাঁচে।
নইলে ত শুধু আত্মশাসনে ঠাসা
মন থাকে ঘেরা ক্ষণভঙ্গুর কাঁচে।
কোনোদিন, জানি, আত্মপ্রসাদ ভেঙে
চুরমার্ হবে মানুষের গায়ে লেগে।
ধ্বংস-ধূসর অবশেষ যাবে রেঙে
লেন্-এভেনিউ-পার্ক মন্থন বেগে।

তবু সেই মুখ, ক্লান্ত দিনের পারে
পিছু পিছু কালো রাত্রির মত আসে,
প্রলাপ-প্রখর শাণিত মনের ধারে
এলোমেলো ভিড় মেলা ভাঙ্‌বার পাশে।
তাই মনে বলি, হায় ঝরে যাওয়া পাতা
আমি ত তোমারই দলে আছি, জান না তা!
জনারণ্যের সহর বালুকা পাতা
তার নিচে দেখি শিকড় গিয়েছে মরে।
অর্কিড-হাতে নীল ফুল মাথা নাড়ে,
জানালার ফুল মাটির অভাবে বাড়ে,
স্নিগ্ধ হাতের সৌখিন স্নেহ কাড়ে ;
হাওয়ার পৃথিবী হাওয়াতেই যায় ঝরে।

দম্ভ

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

এ কথা সবাই জানে দম্ভ আছে মনে,
ওতপ্রোত শিরে শিরে। নিয়তই তাই
আযোজন প্রহরের বৃথা অন্বেষণে
নির্বীজিত জীবনের ব্যর্থতা জানাই।
মনে হয় সময়ের অন্তিম প্রয়াণে
মননের অভিযানে শবযাত্রী কোনো ;
দূর সম্ভাবনা যত বারে বারে হানে—
বুঝি বা কালের পিছে রহিল এখনো।
তবু এই নিরক্ষর পত্র বর্ণহীন,
শূন্য প্রমাদেই রহে পাণ্ডু শ্বেতকায়।
নিগুর্ণ ক্লীবের মৈত্রী প্রজননে ক্ষীণ,
প্রাক্তন বিস্মৃতি তলে কখন পালায়।
দেখি বসে ধায় কাল মহা আড়ম্বরে।
সুকৃতের নেই দায়, মরি চরাচরে।

আলাপ

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আবার বসন্ত

তবে কি নাছোড়বান্দা ফাল্গুন, কম্‌রেড ?
বসন্ত বিজ্ঞপ্তি আঁটে ঘূর্ণিফল গাছে।
পর্দায় সর্দার হাওয়া কসরৎ দেখায়।
আকাশে অসংখ্য টর্চ। মেঘেরা ফেরার।
গোলদীঘির গর্ত্তে চাঁদ ধরা পড়ে গেছে।

বসন্ত সত্যিই আসবে ? কী দরকার এসে ?
বছর-বছর দেখা দিয়েছে তো ক্যাম্বেলের ভিড়ে।

পণ্ডশ্রম

কয়েকদিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে—
কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় গোরু খোঁজা ক'রে
নীলাকাশে, অন্ধকারে গৈরিক নদীতে।
তারপর আগ্রহারা অধিক রাত্রিতে
যে-কারো ইঙ্গিতে সাড়া দিয়েছি যখন—

তখনি পিছন থেকে বলেছে বিদায়
ভগ্নমনে সচ্চরিত্র গুপ্তচর কোনো।

পণ্ডিতমূর্খ

লেনিন, এঙ্গেল্‌স্‌, মার্ক্স নখাগ্রে আমার।
উত্তরাধিকারসূত্রে অন্যতম নেতা।
লক্ষ্য বড়ো, ধরি তাই মহাত্মার ধামা।
আনন্দ-ভবনে খুঁজি মুক্তির উপায়।
প্রতিদ্বন্দ্বী, ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছি কেমন?

এবার বিধ্বস্ত চীন মন্দ লাগ্‌বে না।
—ভারতবর্ষে বিপ্লবের দেরি নেই আর

স্বদেশ

মণীন্দ্র রায়

ম্রিয়মাণ হৃতশক্তি হে স্বদেশ,
প্রণাম। শতাব্দীশেষে
মূঢ় তমিস্রার; সূর্য্যোদয় আরক্ত গম্ভীর
বিহ্বল দিগন্তপারে, স্থাণু জনতার
স্নায়ুজালে—ধমনীর লোহিত বিস্ময়ে।
জাগে স্তম্ভিত মাটির
দলিত নিরুদ্ধ স্বাধিকার।
স্থবির শতাব্দীশেষে হে স্বদেশ, প্রণাম আমার।

দম্ভের প্রাসাদচূড়া হ'তে
নিপিষ্টের বঞ্চিতের পুঞ্জীভূত বেদনার স্রোতে
যাহারা দেখেছে শ্লেষে মেখলার প্রায়,
পিশাচ বাতাসে ঘোরে সে-কলঙ্ককরুণ অধ্যায়।

স্বর্ণরশ্মি দিবসের উচ্চকিত গতি
মর্ম্মরিত জনারণ্যে আনে আজ সবুজ উল্লাস।
যুগান্ত-তোরণপথে জয়যাত্রা। শ্লথপাশ
জীবনের, জড়তার।
হে স্বদেশ, প্রণাম আমার।

পথনির্দ্দেশ

(শ্রী সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কে)

মণীন্দ্র রায়

প্রবলপ্রতাপ রাজা বঙ্গচন্দ্র পাল,
সমাচার জ্ঞাত আছি চিঠি মারফৎ ।
কিষাণ ও সাম্যবাদী করেছে নাকাল ।
নজর খাজনা আদি আয় যৎ তৎ :
অথচ খরচ আছে ! সাধু সরকার
উভয় সঙ্কটে আছে গৃহ আগলিতে
হয়ত বা ছেড়ে দেবে শাসনের ভার
কংগ্রেসের ঋষিহস্তে । তবুও ইঙ্গিতে
বলে দেব বীজমন্ত্র ।—অহিংসা প্রভাবে
নেতাদের হাতে কিছু ইয়ে দিয়ে দিন,
(মানপত্রসহ তোড়া !) চাকা ঘুরে যাবে ।—
এখনো ভারতবর্ষে ততটা সঙ্গীন
হয়নি রিপুর দশা বিপ্লবী মহলে ।
টিঁকে যাবে সর্ব্বদিক স্রেফ বুদ্ধিবলে ।

নতুন কবিতা

১৩৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা। রমাপতি বসু সম্পাদিত। উদয়াচল পাবলিশিং হাউস। একটাকা।

বাংলাদেশে ছাপা খুব শস্তা। এত শস্তা যে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার মধ্যে ছোটোখাটো একটি বই প্রকাশ করা সম্ভব। এতদিন আমার ধারণা ছিল যে এই ভালো ; কেননা ছাপা শস্তা ব'লেই আধুনিক কবিরা মাঝে-মাঝে নিজের খরচে দু' একটি বই বার করতে পারেন। কিন্তু '১৩৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামক পুস্তিকাটি দেখবার পর আমার মত বদলেছে। ছাপা ব্যয়-সাপেক্ষ হ'লে এ-বইটি হয়তো বেরুতে পারতো না, এবং সেটুকুই হ'তো মঙ্গল। নিজেদের 'লেখক' ব'লে কল্পনা করেন এমন যুবকের সংখ্যা বাংলাদেশে নিদারুণবেগে বেড়ে চলেছে ; এবং এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ উপায়ান্তরে হতাশ হ'য়ে একটি পত্রিকা বা সংকলন-গ্রন্থের 'সম্পাদক' হ'য়ে বসেন, কেননা ছাপার অক্ষরে নাম বেরোলেই 'সাহিত্যিক' হওয়া যায় ; তার জন্যে, আর কিছু না হোক্, অন্তত ব্যাকরণ ও বানান শিক্ষা করা যে দরকার সেটুকু চৈতন্যও এঁদের নেই। আলোচ্য বইটির উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, স্বয়ং সম্পাদক ও তাঁর কয়েকটি বন্ধুর 'সাহিত্যিক' জন্ম লাভ। নেহাৎই নিজেদের রচনায় আবদ্ধ হ'লে ভালো দেখায় না, তাই কয়েকজন বিশিষ্ট আধুনিক কবিকে টেনে এনে অপমান করা হয়েছে। সম্পাদক মহাশয় ও তাঁর বন্ধুদের রচনার নমুনা এইরকম ;

মধ্যরাত্রে মিড্ল রোড-এ নৈঃশব্দ্য ঝুলছে
গরুর মাংসোর (*sic*—'স' বোধ হয় s-এর মতো পড়তে হবে) মতো।

আগুনের তাতে পুড়ে' কামারে
শানিয়ে—করে তাকে চকচক,
তাই ওই সুর বাঁধে 'হামারে'
ঘা দিলে—বেজে ওঠে ঠকঠক।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৬

জেগে ওঠো। এই তো সুযোগ! ভগ্ন উরু দুর্যোধনের মতো
বণিক সভ্যতা খঞ্জ হয়ে এলো
দ্বৈপায়ন-হ্রদ আর জিব্রালটারের ইতিহাস
একই অক্ষরে লেখা হোক্।

মন্তব্য বাহুল্য। মলাটের উপর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' লিখে দিলেই যে ভিতরের সব জিনিস 'শ্রেষ্ঠ' এমন কি 'কবিতা'ও হয় না, এ-কথা এ-বইয়ের সম্পাদক কি প্রকাশক জানেন ব'লে মনে হয় না। আত্মম্ভরিতার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে মূঢ়তার যে বিকট রূপ প্রকাশ পায়, এ-বইটি তারই দলিল। অথচ বিষয়বুদ্ধির পরিচয়ের অভাব নেই; কেননা কবিদের নির্বাচনে প্রথমে যেটা নির্বোধ খেয়াল মনে হয়, আসলে সেটা গূঢ় কারণপ্রসূত। এ বিষয়ে আমার অনুমান নিবেদন করছি। প্রথমেই মনে হয়, হুমায়ুন কবির কবি-হিসেবে কি এতই বড়ো যে তাঁকে নিতেই হ'লো, আর তাও তাঁর এমন একটি কবিতা, যা ১৩৪৫-এর তো নয়ই, বহু আগেকার লেখা? এর কারণ বোঝা অবশ্য শক্ত নয়; কবির একটি সম্ভ্রান্ত ত্রৈমাসিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এবং সম্পাদকের বোধ হয় ধারণা যে বাংলা সমালোচনা আসলে বিনি পয়সার বিজ্ঞাপন। তারপর, যে-বইয়ে হেমচন্দ্র বাগচী, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (আরো অনেকের নাম করলুম না) অনুপস্থিত, সে-বইয়ে বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রীতিকর আবির্ভাবের কারণ একজন বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছাড়া আর কী হ'তে পারে? অরুণকুমার মিত্রের মতো অতি-নতুন কবিও যে বাদ যাননি, সে কি আনন্দবাজারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের জন্যেই নয়? সুরেন গোস্বামী মশাইও আছেন দেখলুম, তিনি 'প্রগতি'-আন্দোলনের পাণ্ডা, তাঁকে খুসি রাখতে হয়। আর দিলীপকুমার! হ্যাঁ, একজন কেউ-কেটা লোক তো বটেন, তাঁকে না নিলে কি চলে! শুনেছি, এই বইয়ের প্রকাশক ও মুদ্রাকরের সঙ্গে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কিত: মাণিকবাবু যে এ-বইটি বেরুতে দিলেন তাতেই আমি যথেষ্ট অবাক হয়েছি; কিন্তু 'উত্তর দক্ষিণ' নামক কবিতাটি যদি তাঁরই লেখা হ'য়ে থাকে তাহ'লে একথা জোর ক'রেই বলবো যে নিজের প্রতিষ্ঠার এমন গুরুতর হানি ঘটতে দেবার অধিকার তাঁর নেই।

কবিতা

আশ্বিন, ১৩৪৬

তবু হয়তো বইটিকে ক্ষমা করা যেতো, যদি না সম্পাদক তাঁর ভূমিকাটি লিখতেন। মূর্খতা, বেআদপি ও নির্লজ্জতার এটি একটি এগ্‌জিবিশন। 'মূঢ় সাধারণকে হাতুড়ির ঘা মেরে সাহিত্যকে (*sic*) বোঝাতে হবে। অবশ্য এটা শুধু আমার মত নয়, এটি ট্রটস্কীর মত।' ট্রটস্কির সঙ্গে এত সহজে একমত হ'য়ে না গিয়ে লেখক যদি বলতেন, 'ঐ নিয়েই তো ট্রটস্কির সঙ্গে আমার ঝগড়া!' তাহ'লে বিরিঞ্চিবাবার পাশাপাশি তাঁর বাক্যটিও স্মরণীয় হ'য়ে থাকতে পারতো। '১৩৪৫ সালে প্রকাশিত কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এমন কোন ভাল কবিতা পাইনি যা সঙ্কলনে প্রকাশ করা যায়'—একথা যে লিখতে পারে তার একমাত্র স্থান বোধনা-নিকেতন; সেখানে, শুনেছি, জন্ম-হাবাদের চিকিৎসা করা হয়। 'যাঁরা প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব; সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রভৃতিকে অনুকরণ ক'রে কবিতা লেখেন, তাঁদের বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি।' অথচ বইয়ের অন্তর্গত হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতাটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি প্রসিদ্ধ কবিতার হুবহু অনুকরণ, আর সমর সেনের অনুকারকদের কথা আর কী বলবো, তারা দস্তুর-মতো পাব্লিক ডেঞ্জার হ'য়ে উঠছে, যদিও এ-বইয়ে যাঁরা আছেন তাঁদের সে-খেতাব দিলে সমর সেন হয়তো আমার নামে মানহানির মামলা আনতে চাইবেন। এ ছাড়া, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অনুকারকদের কথা না ব'লে তিনি কোন-কোন কবিকে অনুকরণ করেন সে-গবেষণাই বেশি প্রাসঙ্গিক।

বেকার সমস্যা দেশে বাস্তবিকই ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছে। যুবকদের কিছু করবার নেই; নৈরাশ্য এত গভীর যে কলেজের পড়াশুনোতেও তারা মন দেয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নির্দিষ্ট ও নিয়মিত কোনো কাজ করবার থাকলে এই সংকলন-সম্পাদকের মতো 'সাহিত্যিক' যুবকরা ভদ্র ও সুস্থভাবেই জীবন কাটাতেন; কাজের অভাবেই সাহিত্যচর্চার উৎকট চেষ্টায় নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন। এই বই নিয়ে এতখানি আলোচনা আমি শুধু এইজন্যই করলুম যাতে সংকবিরা সাবধান হ'তে পারেন, এবং ভবিষ্যতে এ-রকম বই আর বেরোতে না পারে। নয়তো এ-বই উল্লিখিত হবারই যোগ্য নয়।

আশ্বিন, ১৩৪৬

আর-একটি কথা। ক-এ দীর্ঘ ঈকার কী এবং কোলন চিহ্ন এ দুটি বস্তু অলঙ্কার নয়, এদের বিশেষ অর্থ ও ব্যবহার আছে, এবং কোলন-এর জায়গায় বিসর্গ ছাপা হওয়াও হাস্যকর। অবশ্য এ-বইটির ছাপা দেখেই বোঝা যায় যে সম্পাদক কি প্রকাশকের কবিতা সম্বন্ধে ছিটেফোঁটা জ্ঞানও নেই; তবু 'কী' ও বিসর্গরূপী কোলনচিহ্নের অপব্যবহার দেখে-দেখে এমন ঘেন্না ধ'রে গেছে যে এ প্রসঙ্গে সে-বিষয়ে উল্লেখ না ক'রে পারলুম না।

বুদ্ধদেব বসু

নতুন বই

আধুনিক বাংলা গল্প:—সম্পাদক, প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস। প্রগতি সাহিত্য ভবন থেকে প্রকাশিত। দাম তিন টাকা।

আজকের মানুষের সর্ব্বদাই ব্যস্ত ভাব, জীবিকার তাগিদে সবসময়েই সে সন্ত্রস্ত। ফলে দীর্ঘ উপন্যাস গ্রহণের ধৈর্য্য তার কম। তা ছাড়া আজকের জীবনে দীর্ঘ উপন্যাসও বিরল, খাপছাড়া টুকরো ঘটনার এলোমেলো সমাবেশই প্রধান হয়ে পড়ছে। ফলে সাহিত্যিকও প্রধান ঝোঁক দিয়েছেন ছোট গল্প রচনার দিকে। ছোট গল্পের সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তার সঙ্গে আরও একটা কারণের যোগ হয়ত আছে—মাসিক ও সাপ্তাহিকের অজস্র প্রসার। এগুলোয় উপন্যাসের চেয়ে ছোট গল্পই বেশী চলে। অথচ পাশ্চাত্য ছোট গল্পের যে ধারার সঙ্গে আমরা আজকাল পরিচিত, তা খুব বেশীদিনকার নয়। বোধ হয় বিংশ শতাব্দী থেকেই তার সূত্রপাত বলা যায়।

তবে ইয়োরোপে ছোট গল্পের উন্নতির পাশাপাশি সিনেমার উন্নতি চোখে পড়ে, অনেক সময় দুটোই সমধর্ম্মী আঙ্গিক আশ্রয় করেছে। বাংলায়ও ছোট গল্পের উন্নতি দেখা গেল অবিশ্বাস্য অল্প সময়ে, অথচ সিনেমা সেই পেছিয়েই রইল। এর কারণ বোঝা অবশ্য কঠিন নয়; আধুনিক বাঙালী গল্পলেখকরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্যে নির্ভর পেয়েছেন, সিনেমায় কোন মহান ভিত্তির উপসর্গ দেখা যায় নি।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উত্তরকালের ছোট গল্প লেখকরা হয়ত বড় একটা ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। তবুও তাঁর নির্দ্দিষ্ট পথে অনেকেই অনেকদূর এগিয়েছেন বইকি। কারণ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতির যে সব ছোট গল্পের সঙ্গে আজকাল আমরা পরিচিত, শুধু ভঙ্গির দিক ছাড়াও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়েও এঁদের অগ্রগতি প্রত্যক্ষ। তবে শরৎচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় আর প্রমথ চৌধুরীর কথাও এখানে তুলতে হয়। কারণ রাবীন্দ্রিক যুগে ছোট গল্পের যে দুটো প্রধান ধারা চোখে পড়ে তার জন্যে, এঁরা দুজন অনেকখানিই দায়ী।

শরৎচন্দ্রের কথায় মন আজকাল সায় দেয় না মানি। কারণ তাঁর রচনায় সার্থক ছোট গল্প বিরল, অসংযত ভাবালুতায় হাঁপিয়ে উঠতে হয়। তবুও ঐতিহাসিকভাবে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের পরেই হয়ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্প খুব খাপছাড়া হত, হয়ত সম্ভবই হ'ত না। বাংলা ছোট গল্পের এদিককার ধারার জন্যে শরৎচন্দ্রকে মূল্য না দিয়ে উপায় নেই।

আর প্রমথ চৌধুরীর মারফৎ ছোট গল্পের আর একটা ধারা বাংলায় এসেছে। বুদ্ধদেব বসু, মণীন্দ্রলাল বসু ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের কথাই এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁরা গল্পের বক্তব্যের চেয়ে রচনাভঙ্গি সম্বন্ধে অনেক বেশী সচেতন। বহির্জগতের চেয়ে মানুষের অন্তর্জগতের খোঁজ দিতেই এঁরা বেশী ব্যস্ত, এদের নায়ক-নায়িকারা ঘটনার ঘূর্ণিপাকে তত জড়িয়ে নেই, কথার জাল বুনতেই সময় কাটান।

অবশ্য সব পাঠকের রুচিই সমান নয়, সাহিত্য বিচারে কেউ শুধু আঙ্গিকের দিকটা বড় করে দেখেন, কেউ বা জোর দেন বক্তব্যের দিকে, তাই হাল বাংলার সব ছোট গল্প লেখকদেরই যে সব পাঠকের উপর সমান প্রভাব হবে তা আশা করা উচিত নয়। আর, বিষয় বড় না ভঙ্গি বড় এ তর্ক খুব সহজে মেটবারও নয়, অন্তত পুস্তক সমালোচনায় সে অবসর নেই। তবুও বাংলা ছোট গল্পের এই বিভিন্ন ধারাই প্রমাণ করে বাংলায় ছোট গল্পের উৎকর্ষ আজ অনেকদূর এগিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের কথা ভাবলে এ প্রগতিকে অবিশ্বাস্য মনে হয় বইকি। এটা অবশ্য দুঃখের কথা যে এত উন্নতি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আমরা বাংলা আধুনিক ছোট গল্পের সঞ্চয়ন পাইনি। এবং শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস যে এই প্রথম সে দিকে মন দিলেন তার জন্যে তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। সঞ্চয়ন প্রকাশ করবার বিরাট দায়িত্বের কথা ভেবে

পাঠক হয়ত খুচরো দোষত্রুটিকে ছোট করে দেখতে রাজী হন। ফলে, গরমিল বহু থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য বইটিকে সানন্দে গ্রহণ করেছিলুম; বিশেষত আধুনিক বাংলা গল্পের এ ধরণের সংগ্রহ এই প্রথম। সম্পাদক অবশ্য আধুনিক কথাটার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মানে করেছেন, অর্থাৎ তাঁর সঞ্চয়নে শুধু তাঁদেরি গল্প আছে এখন বয়েস যাঁদের তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। ফলে পঁচিশ বছর বয়েসের যদি কেউ খুব ভাল গল্পও লিখে থাকেন নিছক নাবালক হিসেবে বোধ হয় তিনি এ সঙ্কলনে প্রবেশাধিকার পাননি, যদিও বলা যেতে পারে, অন্তর্গত কোনো-কোনো গল্প যখন লেখা হয় তখন লেখকদের বয়েস পঁচিশের বেশি হয়তো ছিল না; এবং চল্লিশোত্তর ভদ্রলোকেরাই বা "আধুনিকদের" সঙ্গে সিং ভেঙে রং করেন কি-করে? আমার অবশ্য মনে হয় সম্পাদক লেখকদের বয়েসের দিকে জোর না দিয়ে লেখকদের বিশেষ-কোনো দৃষ্টিভঙ্গিকে আধুনিকতার মাপকাঠি ঠিক করলে পাকা কাজ করতেন, কারণ কত বছর থেকে কত বছর বয়েসের লোকেরা আধুনিক তা ঠিক করতে ব্যক্তিগত খামখেয়ালের উপরেই নির্ভর করতে হয়। তাহলে সমস্ত গল্পগুলোর মধ্যে একটা অন্তত মূলসূত্র বার করবার চেষ্টা করা যেত, এবং পাঠক তরুণদের লেখা কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা থেকে বঞ্চিত হতেন না। তাই বলে পাঠক যে খুব বেশী বঞ্চিত হয়েছেন এ কথা বলতে চাইনে, কারণ এ একটা ভারি মজার ঘটনা যে আধুনিক বাংলায় যাঁরা ভাল গল্প লেখেন তাঁদের অধিকাংশেরই বয়েস তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে, এবং অনেক সময় তাঁদের লেখায় একই দৃষ্টিভঙ্গি বেছে নেওয়া অসম্ভব নয়। ফলে, সম্পাদকের খাম-খেয়ালী দৃষ্টি সত্ত্বেও "আধুনিক" কথাটার বিকৃত রূপ সঞ্চয়ন পাঠে ধরা পড়ে না।

রয়েল তিনশো আটত্রিশ পাতার বই, কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি পরিষ্কার। তবে বাংলা বইএর সমালোচনায় অজস্র ছাপার ভুল ও বানান ভুল নিয়ে কথা তুলতে আজকাল নিজেদেরই লজ্জা করে। তাই সে সব কথা থাক। বইটির অনেকদিক দিয়েই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। প্রথমত লেখকদের পরিচয়। অবশ্য অনেক সময়েই পরিচয়কে অযথা দীর্ঘ করা হয়েছে। যেমন, লেখার ভাল মন্দ বিচার এর মধ্যে করতে গিয়ে। তার জন্যে সম্পাদক ত একটা ভূমিকাই

লিখেছেন। তা ছাড়া কতগুলো অবান্তর কথা পরিচয় থেকে অনায়াসে তুলে দেওয়া যেত। যেমন: "১৯৩৩এর প্রথম দিকে এঁর (বুদ্ধদেব বসুর) 'এরা আর ওরা' ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'বিবাহের চেয়ে বড়' ও 'প্রাচীর ও প্রান্তর' এই তিনখানি উপন্যাস 'অশ্লীলতা'র অভিযোগে বাজেয়াপ্ত করা হয়।" এবং পরিচয়ের মধ্যে hero-worship, যেমন প্রবোধ সান্যালের বেলায়, দৃষ্টিকটু ঠেকে।

অনেক লেখকেরই অবশ্য এ সঙ্কলনে যে সব গল্প স্থান পেয়েছে তার চেয়ে ভাল গল্প বাছা যেত। ব্যক্তিগত ভাল লাগার দোহাই এখানে দেওয়া চলে কিনা সে তর্ক দীর্ঘ হবে। তবে অন্তত প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প সম্বন্ধে আমি খুব কম পাঠকই চিনি যাঁরা এ-বইয়ের গল্পগুলোকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প বলবেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের "পুতুল ও প্রতিমা" বা "মৃত্তিকা" বাংলা শ্রেষ্ঠ গল্পের বইএর তালিকায় উঠবেই, তাই সেখান থেকে গল্প থাকবে আশা করেছিলুম। (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচয়ে একটা ভুল খবর ছাপা হয়েছে, তুচ্ছ হলেও মার্জনীয় নয়—"মৃত্তিকা" প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের বই, উপন্যাস নয়।) মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাত্র দুটো গল্প দেখে হতাশ হতে হয়। সম্পাদক হয়ত বইএর আয়তনের দোহাই দিতে পারেন। কিন্তু যে-সঙ্কলনে প্রবোধ সান্যাল, বনফুল বা মনোজ বসুর দুটো করে গল্প দেবার জায়গা হল সেখানে এ অজুহাত টেঁকে না। আসলে এ যেন মুড়ি মিছরির সমান দাম দেওয়া। এ ছাড়া আলোচ্য বইতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দুটো করে গল্প আছে: এ গল্পগুলোর বাছাই মোটের উপর ভালই লাগে, যদিও বুদ্ধদেব বসুর "তুলসী গন্ধে"র চেয়ে ভাল গল্প বোধ হয় বাছা অসম্ভব হত না, বিশেষত গল্পটাতে ডি, এইচ্, লরেন্সের "দি ওডর্ অফ্ ক্রিসেন্থিমম্স্'-এর প্রভাব যখন প্রত্যক্ষ। অন্নদাশঙ্কর রায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, শিবরাম চক্রবর্ত্তী ও সরোজকুমার রায়চৌধুরীর একটা করে গল্প রয়েছে: এবং একটা করেই থাকা

উচিত। যদিও মনে করা হয়ত অন্যায় নয় যে যদি বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের গল্প রইল তাহলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পও একটা থাকতে পারত। কিন্তু বইটির সব চেয়ে বড় বাদ বোধ হয় মণীশ ঘটক। জানিনে বয়েসে ইনি "আধুনিক" কি না, তবে এঁর গল্প আধুনিক এবং ভাল। আশা করি সম্পাদক পরের সংস্করণে এ ত্রুটি মনে রাখতে চেষ্টা করবেন।

আলোচ্য বইএর সব-চেয়ে পীড়াদায়ক ব্যাপার এর ভূমিকা, সম্পাদক যার নামকরণ করেছেন "আরম্ভে"। কারণ জ্যাকেটের বেখাপ্পা ছবিটা এই বলে হয়ত উপেক্ষা করা চলে যে জ্যাকেটটা বেশীদিন টিঁকবে না, এবং "আধুনিক" কায়দার উৎসর্গ—

> "নতুন দিনের আলোয় দৃষ্টি যাদের উজ্জ্বল
> নবীন বাংলার সেই পাঠকপাঠিকাকে—"

হয়ত এই ভেবে সহ্য করা যায় যে ওখানে অনেক বেশী উৎকট নামও থাকতে পারত, কিন্তু ভূমিকাটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া, অসম্ভব। তার কোনো ক্ষমাই নেই। পাঠক হয়ত ছোট গল্প সম্বন্ধে সম্পাদকের কাছে পরিচয় একটা আশা করেন, কিন্তু "আরম্ভেই" দেখা গেল—"থিয়োরী অফ্ রিলেটিভিটি", "সীমাবদ্ধ সংস্কারের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন বাণীদেবতা" (!), "উৎপাদন সম্পর্ক" "রবিবাবুর অভিমানটার মানে", "জীবতত্ত্ব", "রবিবাবু সম্বন্ধে একটা ট্রাজেডি" ইত্যাদি। এত সব গালভরা কথা পাড়ার পর সম্পাদক বললেন—"শ্লেষ-ব্যঙ্গ আর কটূক্তি কণ্টকিত বিরুদ্ধ সমালোচনার আঘাতে সে (মানে বেচারা আধুনিক সাহিত্য) আজ ক্ষতবিক্ষত। আজ নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই সমালোচনার প্রত্যেকটি কাঁটাকে নিক্তির তৌলে যাচাই করা; আজ পর্য্যন্ত যে তা হয়নি এটাই বিস্ময়ের।" পাঠকও বিস্ময়ের চেষ্টা ক'রে হয়ত আশা করেন এবার সে বিচার সুরু হবে। কিন্তু সুরু যা হল তা অত্যন্ত নির্লজ্জ। বলা নেই, কওয়া নেই, বিশ্বাস মহাশয় শিবরাম চক্রবর্ত্তীর "আজ এবং আগামী কাল" থেকে স্রেফ্ অনেকখানি টুকে দিয়েছেন। পাঠক এবার সত্যিই বিস্মিত হন। উদাহরণ:

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যধর্ম্ম বলে একটি প্রবন্ধ লিখেচেন, একদল লোক তাতে সায় দিয়ে বলচেন, আমাদেরও ঐ কথা! অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের যা সাহিত্যিক ধর্ম্ম তাঁদেরও তাই।

ভক্তির উচ্ছ্বাস জিনিষটে হয়ত ভালোই, কিন্তু উচ্ছ্বাস যখন অত্যাচার হয়ে দাঁড়ায় তখনই বিপাক! তাঁরা অন্য দলকে লক্ষ্য করে বলচেন, তোমাদেরও কেন ঐ ধর্ম্ম নয়?...

অপর পক্ষ নীরব। সাহিত্য বস্তু যে কী তা তর্ক করে বোঝান যায় না, সৃষ্টি করে বোঝাতে হয়। এবং সেজন্য কোলাহল থেকে সতর্ক থাকতেই হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম্ম'—তা রবীন্দ্রনাথেরই সাহিত্যধর্ম্ম, তাঁর একান্ত নিজস্ব—তার প্রতিবাদ করার কিছু নেই; রবীন্দ্রনাথের যা সাহিত্যিক ধর্ম্ম তা ন্যুট হামসুন্‌ বা বর্নার্ড শ'র সাহিত্যিক ধর্ম্ম নয়।

প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্যধর্ম্ম" বলে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। একদল লোক তাতে সায় দিয়ে বল্লেন—আমাদেরও ঐ পথ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের যা সাহিত্যধর্ম্ম তাঁদেরও তাই। ভক্তির উচ্ছ্বাস জিনিষটা হয় ভালইত কিন্তু উচ্ছ্বাস যখন অত্যাচার হয়ে দাঁড়ায় তখনই বিপদ। তাঁরা অন্য দলকে লক্ষ্য করে বলতে থাকেন, তোমাদেরও কেন ঐ ধর্ম্ম নয়।

অপর পক্ষ নীরব। সাহিত্য বস্তু যে কি তা তর্ক করে বোঝানু যায় (না) এবং সে জন্যে কোলাহল থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই শ্রেয়।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম্ম' তা রবীন্দ্রনাথেরই সাহিত্যধর্ম্ম, তাঁর একান্ত নিজস্ব, তার প্রতিবাদ করবার কিছু নেই।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধর্ম্ম আর নুট্ হ্যামসুন বা বার্ণার্ডশ'র সাহিত্যধর্ম্ম এক নয়।

দুটো বই থেকে পাশাপাশি কপি করে যেতে মাথা ধরে; তাই এ ফিরিস্তি দীর্ঘ করবার উৎসাহ পেলুম না। উৎসাহী পাঠক বই দুটি মিলিয়ে দেখতে পারেন।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী প্রণীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সম্বন্ধে কোনো ভালো বই বেরুনো বাংলা সাহিত্যে একটা স্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্র-কাব্যের যেটুকু আলোচনা আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, তা'র পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য। আরো দুঃখের বিষয় যে, সে-সব আলোচনার অধিকাংশই পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের কাব্য-সম্বন্ধে অবৈদগ্ধ্যের তুঙ্গী নিদর্শন মাত্র। কোনো কবির কাব্য ব্যাখ্যা বা আলোচনা করবার আগে তাঁর সমগ্র কাব্য বুঝে তা'র মূলগত ঐক্য বা বিবর্ত্তন উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে অনেকেই ভুলে' যান। এই জন্য শৈশব থেকে ইস্কুল ও কলেজের পাঠ্য পুস্তকে উদ্ধৃত কবিগুরুর·বিচ্ছিন্ন কবিতাখণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হয়েও, এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সম্বন্ধে দু'একখানা বই পড়েও অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরই রবীন্দ্র-কাব্য বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। আলোচ্য বইয়ের লেখক কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র, অধ্যাপক, রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছেন, এবং—যা সব চেয়ে বড় কথা—নিজে একজন বিশিষ্ট কবি। কাজেই প্রমথবাবুর হাত থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সত্যকার উপভোগ্য এবং গভীর আলোচনাই আশা করি। সৌভাগ্যের বিষয় প্রমথবাবু সে-দিক থেকে আমাদের একেবারে নিরাশ করেননি; তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মর্ম্মস্থলেই প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছেন। অন্ধের হস্তী-দর্শনের মত তা'র কোনো বিশেষ অংশকেই বড় করে' দেখতে চেষ্টা না করে' বিশী মহাশয় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র প্রকাশ থেকে 'বলাকা'র প্রকাশ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের চৌত্রিশ বৎসর মাত্র প্রমথবাবুর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত এবং রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহের এই খণ্ডিত অংশকে তাঁর নিজস্ব মতানুযায়ী তিনি চারটি বিশিষ্ট পর্ব্বে ভাগ করেছেন। প্রমথবাবুর এই বিশ্লেষণ ছাত্রজনের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও তাঁর বইয়ের নামের সঙ্গে সুসঙ্গত কিনা সে-প্রশ্নের অবকাশ আছে। তা ছাড়াও, গানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অসম্ভব বলেই এতদিন আমার বিশ্বাস ছিলো। গানের আলোচনা বাদ দেবার কৈফিয়ৎ হিসাবে

প্রমথবাবু জীবনস্মৃতির যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন কাব্য-সমালোচকের পক্ষে কবির সে সবিনয় উক্তি যথেষ্ট সাফাই হ'তে পারে কিনা তা-ও সন্দেহের বিষয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রমথবাবুর দু'টি উক্তিও এই সম্পর্কে উল্লেখ-যোগ্য :

"অবশ্যই তিনি গীতাঞ্জলির কবি, কিন্তু তাহা একাংশ মাত্র, এবং **অবশ্যই শ্রেষ্ঠ অংশ নহে।**" (বড় অক্ষর আমার)

অন্যত্র, "গীতাঞ্জলিতে যে অভিজ্ঞতার বিকাশ, গীতিমাল্যে আসিয়া তাহা পূর্ণতর হইয়াছে, কিন্তু গীতালি পড়িলেই স্পষ্ট দেখা যায়, সে অভিজ্ঞতার বর্ণ ফিকা হইয়া আসিতেছে, সে প্রেরণা অনেক পরিমাণে চলিয়া গিয়াছে, কেবল তাহার ঝোঁকটা রহিয়াছে মাত্র। তার পরেই বলাকা। **সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বের অন্ধকারটিই গভীরতম। বলাকার পূর্ব্বেই গীতালি।**" (বড় অক্ষর আমার)

রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে প্রমথবাবুর দুটি বক্তব্য খুব পরিষ্কার। প্রথম, রবীন্দ্রনাথের গানগুলির সাহিত্যিক মূল্য যদি কিছু থাকে তো সে সামান্য; দ্বিতীয়, ভগবৎ-প্রেম জিনিষটা রবীন্দ্রনাথের মূল প্রেরণার অন্তর্গত নয়। স্পষ্টতই, 'মিস্টিসিজম্' কথাটাকে প্রমথবাবু অপছন্দ করেন এবং কোনোক্রমেই রবীন্দ্র-নাথের রচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে রাজি নন্। কিন্তু যে জিনিষ মানুষের অনু-ভূতির প্রায় অতীত, তার উপলব্ধি ও প্রকাশকে যদি কোনো নাম দিতেই হয়, তবে মিস্টিসিজম্ কথাটা নেহাৎ মন্দ নয়। এবং আমার মতে এই লোকাতীত অভিজ্ঞতা বা তা'র প্রকাশ কোনোটাই নগণ্য জিনিষ নয়। তা ছাড়া, রবীন্দ্র-নাথের গান কি কেবল শ্রুতিমধুর? সেগুলি কি পঠনযোগ্য নয়? ধরা যাক গীতাঞ্জলির

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে,
এ-কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবনভ'রে।

এ ক'টি লাইন প'ড়ে প্রমথবাবু কি অন্তরে অন্তরে কোনোদিন শিহরিত হন্‌নি? এমন কোনো দিন আসা সম্ভব যেদিন রবীন্দ্রনাথের গান হয়তো লোকে গাইবে না, সঙ্গীতের ইতিহাসে তাঁর দেওয়া স্বরগুলোর বর্ণনা ও খ্যাতিই শুধু পাওয়া যাবে। সেদিন কি প্রমথবাবু মনে করেন—গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্যের কোনো মূল্যই থাকবে না? বোধ হয় প্রমথবাবু রবীন্দ্রনাথের সব গানের স্বর জানেন বলেই তাঁর কাছে গীতাঞ্জলি-গীতালির উৎকৃষ্ট অংশও সুরের জালে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। আমি—যে খুব কম গানেরই স্বর জানি—আমার কাছে গীতাঞ্জলি এক বিস্ময়কর জগতের দ্বার উন্মুক্ত করে' দেয়। হ'তে পারে এ আমার রবীন্দ্রনাথের প্রতি অন্ধ ভক্তিরই পরিচয়। এমনও হ'তে পারে যে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে কাব্যরসিক বলে' পরিচিত সব লোকই মূর্খ নয়।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেদিন লিখলেন—'আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ', সেইদিন থেকেই রবীন্দ্র-কাব্যের আরম্ভ। বিশ্বের সৌন্দর্য্য, ফুল, ফল, নদী, চাঁদের আলো এক কথায় জগতে যা কিছু সুন্দর, এবং সেই সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের স্নেহ-ভালোবাসা-বাৎসল্যের মধ্য দিয়ে জগতের যে অগাধ অসীম সৌন্দর্য্যের বিকাশ, এ-ই রবীন্দ্র-কাব্যের উপজীব্য। জগতের সৌন্দর্য্য তিনি আকণ্ঠ পান করেছেন—এবং সেই সৌন্দর্য্যই তিনি প্রকাশ করেছেন। বাস্তবিকই তিনি জগতের সৌন্দর্য্যসভায় সভাকবি—এইজন্যেই তাঁর কাব্যে প্রায় আগাগোড়াই তিনি স্বয়ং অনুপস্থিত। সোজাসুজি প্রেমের কবিতায়—'আমি তোমাকে ভালবাসি'—এই কথাটা রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন বলেননি—বলা হয়তো তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিলো না। কেননা যে যৌবন-স্বপ্নে তাঁর সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে ছিলো, সেই স্বপ্নই অপরূপ সৌন্দর্য্যে তিনি আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন। এই সমস্ত যৌবন-স্বপ্নের অন্তরালে যাঁর আসন—তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের যেদিন পরিচয় সেইদিন থেকেই তাঁর গানের সুরু, যে-গানগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব সহজ উপলব্ধির অনাড়ম্বর প্রকাশ। ভগবদ্ভক্তি রবীন্দ্রনাথের একটা pose নয়, তা'র চেয়ে সত্য রবীন্দ্রনাথের কাছে আর কিছুই নয়। এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি যেদিন

ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে এলো সেদিনই 'বলাকার' philosophyর উদ্ভব সম্ভব হোলো। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আবার তাঁর যৌবনের অনুভূতিতে ফিরে গেছেন 'পূরবী'তে। যে দিনগুলি তাঁর নিজস্ব ভালোবাসা ও শোকের অনুভূতিতে সমুজ্জল ছিলো—সে দিনগুলিও হারায় নি।

বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে, ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

পূরবী তারই ভূমিকা। সেদিন আর তাঁর মন স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়, সেইজন্যই সেদিন 'পূর্ণতা'র মত কবিতা লেখা সম্ভব হয়েছে।

বিশী মহাশয়ের এই সুলিখিত বইখানাতে দু'একটা উক্তি ছাত্র-ভুলানো কথার মত শোনায়। "রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার প্রধান ধর্ম্ম ইহার মানবমুখিতা," অথবা "রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্বভাব চলতা বা গতি" প্রভৃতি উক্তি আমার মতে প্রায় platitude-এর সামিল।

অজিত দত্ত

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : সমর সেন ; ৬১ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রিট "রংমশাল প্রেসে" শ্রীকানাইলাল গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু। কার্যালয়—কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

কবিতা

পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা | পৌষ, ১৩৪৬ | ক্রমিক সংখ্যা ২০

রোম্যান্টিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক।
সে কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ পথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রং লাগায়েছি প্রিয়ে।
দুয়ার বাহিরে তব আসি যবে
সুর করে ডাকি আমি ভোরের ভৈরবে।
বসন্ত বনের গন্ধ আনি তুলে
রজনীগন্ধার ফুলে
নিভৃত হাওয়ায় তব ঘরে।
কবিতা শুনাই মৃদুস্বরে
ছন্দ তাহে থাকে
তার ফাঁকে ফাঁকে
শিল্প রচে বাক্যের গাঁথুনি—
তাই শুনি
নেশা লাগে তোমার হাসিতে।
আমার বাঁশিতে
যখন আলাপ করি মূলতান
মনের রহস্য তব সুর তার করে যে সন্ধান।
যে কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই

ধূলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।
ফাঁকি দিয়ে বিধাতারে,
কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ্‌রস
আনি তাঁরি জাদুর পরশ।—
জানি তার অনেকটা মায়া,
অনেকটা ছায়া।
আমারে শুধাও যবে এরে কভু বলে বাস্তবিক ?
আমি বলি কখনো না, আমি রোম্যাণ্টিক্।
যেথা ঐ বাস্তব জগৎ
সেখানে আনাগোনার পথ
আছে মোর চেনা।
সেথাকার দেনা
শোধ করি, সে নহে কথায় তাহা জানি
তাহার আহ্বান আমি মানি।
দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমণী দস্যুভীতা,
সেথায় উত্তরী ফেলি' পরি বর্ম,
সেথায় নির্মম কর্ম,
সেথা ত্যাগ, সেথা দুঃখ, সেথা ভেরি বাজুক মাভৈঃ
শৌখিন বাস্তব যেন সেথা নাহি হই।
সেথায় সুন্দর যেন ভৈরবের সাথে
চলে হাতে হাতে॥

দময়ন্তী

বুদ্ধদেব বসু

বিনয় বৃদ্ধের বিদ্যা। দাম্ভিক যৌবন
মনে করে সূর্য তারি সম্ভোগের পথের প্রদীপ,
তারার সেনানী তারি রতি-হ্রস্ব রাত্রির পাহারা।
উদ্ধত সে,
নগণ্য সংকল্প তার নষ্ট হ'লে অদৃষ্টের দোষে
বিশ্বে নিন্দে, আপনারে অক্ষম ধিক্কারে
ক্ষত করে :
'আমি হৃতস্বার্থ, তাই সূর্য কেন্দ্রচ্যুত।'

সহস্র বসন্ত ছিলো আমার যৌবন।
সহস্র চৈত্রের রাত্রি চৈত্ররথ-বনে
কাটায়েছি। সেই রাত্রি, পুঞ্জ-পুঞ্জ বসন্তের মন্থিত অমৃত
যেদিন শরীরে তোর মুঞ্জরিবে, হে কন্যা আমার,
তোর পাণিপ্রার্থী হ'য়ে দেবত্রয় আসিবে সেদিন,
স্বয়ং মহেন্দ্র, অযোনিজ অগ্নি, কালান্তক যম।

স্বর্গ তোরে চায়, যজ্ঞ তোরে চায়, মৃত্যু তোরে চায়।
কিন্তু যৌবনের জাদু স্বর্গ রচে অন্তর গুহায়,
নাভিমূলে যজ্ঞবেদী, মৃত্যু আরো নিচে।
একদিন হংসদূত এসে
তারি সঙ্গোপন মন্ত্র জ'পে গেছে তোর কানে-কানে,
শুনায়েছে প্রিয়তম নাম।
'প্রণাম, প্রণাম
দেবগণ, ক্ষমা করো, ত্রাণ করো বিপন্নারে,

যেন তিনি তারে
সহস্র নলের মাঝে, এই বর দাও।'

ফিরে যাবে দেবগণ। ওরে দেববিজয়িনী
যৌবনগর্বিণী কন্যা,
হে কন্যা আমার,
সেদিন মুখশ্রী তোর পূর্ণিমার মতো
আকর্ষিবে উচ্ছল অশ্রুর বেগ দু'জনের চোখে—
নয়, নয় বিচ্ছেদের শোকে,
আনন্দে, স্মৃতির স্রোতে, অতীতের উত্তরাধিকারে।

শোন্ তোরে বলি :
যে-ত্রিবলী
তোর জন্ম-সিংহদ্বারে প্রহরীপ্রতিম
আজো তা লাবণ্যময়, করুণ, মধুর।
যে-বন্ধুর
শরীর লজ্জিত, আজো, আপনার আকর্ষণ জেনে,
একদিন তার স্বয়ম্বরে
স্বয়ং মহেন্দ্র, যম বৈশ্বানরে
ক্ষুণ্ণ ক'রে যে-মর যৌবন
হয়েছিলো জয়ী,
তার দম্ভে শ্বেত কেশ আজ ব্যঙ্গ করে,
কালাঙ্কিত কপোলে ললাটে
দেবতারি বিপরীত প্রতিপত্তি রটে।

তবু দৈব জাদু ব্যর্থ নয়।

যে-প্রণয়
বিবসন, বিশুদ্ধ, জান্তব
মৃত্যু নেই তার।
আছে শুধু রূপান্তর, আয়ুর সর্পিল সোপানে-সোপানে
আছে নবজীবনের অঙ্গীকার।
যে-মুহূর্তে অনকাম নীবী
খ'সে পড়ে, দেখা দেয় কালের প্রলয়-জলে
সর্বস্ব তিমির-তলে অলজ্জ বদ্বীপ,
অমনি থমকে কলি ; অদৃষ্টের করাল কুহেলি
দীর্ণ ক'রে আদিম পুরুষ
লভে সপ্তদশদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীরে ;
নির্ভয়ে উতরে
স্বগৃহে, স্বরাজ্যে, শান্তির কঠিন তীরে
পুনর্জিত স্বর্গের দুয়ারে।
শিহরে, শিহরে
আজিও সে-কথা মনে হ'লে
এ-জীর্ণ তনুর অন্তরালে
অকাল কঙ্কাল—
যে-মুহূর্তে তরঙ্গিত সময়-সলিলে
দ্বিখণ্ডিত হ'লো ক্রুর অদৃষ্টের শিলা,
ম্লান হ'লো হুতাশন, ব্যর্থ হ'লো যমদণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ,—
বিশ্বাস না হয় যদি, জননীরে শুধায়ে দেখিস।

কিন্তু শেষ শিক্ষা আছে বাকি।
ক্লান্ত আজ স্বেচ্ছাচারী, অজ্ঞান বৈশাখী

একদিন উন্মাদ নৃত্যের তালে-তালে
পঞ্জরে যে মুঞ্জরেছে, সঙ্কীর্ণ কঙ্কালে
করেছে সকাম।
স্তব্ধ আজ রলরোল ; বিলোল আকাশগঙ্গা
ঝরে না ঝরে না আর নীহারিকা-স্বপ্নাকুল উৎসুক নিশীথে ;
অন্ধকারে, চন্দ্রালোকে, সন্ধ্যায় নিভৃতে
শরীরসীমান্ত বার-বার
বিচূর্ণ হয় না আর
উপপ্লাবী বাসনার বর্বর জোয়ারে।
জরার জটিল রেখা শরীরেরে
কঠিন পাথরে ঘেরে ;
এ-দুর্গম দুর্গে বন্দী, অনাক্রমণীয়,
নিশ্চিন্ত আমার সত্তা ; অনর্গল, অক্লান্ত ইন্দ্রিয়
এতদিনে রুদ্ধ হ'লো। অপরাহ্ন ছিন্ন-অঙ্গ মেঘে
সবুজ হলুদ নীলে পশ্চিমে অন্তিম
বাসর সাজালো।
সূর্যাস্তের জাদুকর আলোর আয়না
হাতে নিয়ে সন্ধ্যা নামে : অন্ধকারে জ্বলে শুধু ছায়ার, স্মৃতির
অফুরন্ত ভিড়। এ-শরীর অবলুপ্ত জান্তব যৌবনে
হঠাৎ হারায়। কল্পনা বাড়ায় প্রেত-হাত,
দীর্ঘ ছায়া পার হ'য়ে অতীতেরে আনে সে ছিনায়ে।
সেখানে এখন
বিনষ্ট সংকল্প পূর্ণ, সার্থক ধিক্কৃত অনটন,
স্বার্থ-কেন্দ্র-চ্যুত বিশ্ব ফিরেছে আদিম মহিমায়।

জীবনের সমাপ্তি-সীমায়
শেষ শিক্ষা এ-ই ছিলো বাকি।

শিখেছি বৃদ্ধের বিদ্যা। হাস্যকর, নশ্বর, একাকী
ব'সে-ব'সে চেয়ে দেখি দাম্ভিক যুবক-দল চলে কলোচ্ছ্বাসে,
আর দেখি তোরে, ওরে
দেব-বিজয়িনী যৌবন-গর্বিণী কন্যা, রে কন্যা আমার !
সহস্র নলের ছল ব্যর্থ হবে, ফিরে যাবে
ইন্দ্র, যম, বৈশ্বানর ; দুঃখের কুটিল
অরণ্য পুষ্পিত হবে চৈত্ররথ-বনে
তোর যৌবনেরে ঘিরে। সেদিন আমার
কাল-কলঙ্কিত, তুচ্ছ শরীরে তাকায়ে
এ-কথা বিশ্বাস তোর কখনো হবে না—
সহস্র বসন্ত ছিলো আমার যৌবন,
সহস্র চৈত্রের রাত্রি কাটায়েছি মুহূর্তের পরিপূর্ণতায়।
কবে এলো হংসদূত, ক'য়ে গেলো প্রিয়তম নাম,
অনকাম নীবীবন্ধে আনন্দের ঢেউ তুলে—
সেদিন কখনো ভুলে,
ওরে স্বয়ম্বরা, তোর এ-কথা হবে না মনে—
যে-নারীর দেহ এই পৃথিবীতে তোর সিংহদ্বার
এ-প্রণয় তারি উত্তরাধিকার,
এ-বিশ্ববিজয় তারি কাহিনীর পুনরভিনয়।

তাই তো বিনয়
হৃতশক্তি বৃদ্ধের সম্বল।
অপেক্ষার যে-কলাকৌশল

ধৈর্যের যে-চতুরালি ধনী যৌবনের
ব্যঙ্গের বিষয়, দরিদ্র বার্ধক্য তাই নিয়ে
জীবনের ব্যবসার প্রাক্-প্রালয়িক
ভবিষ্যৎহীন দিনগুলি
সযত্নে কাটায়। অবাস্তব, তুচ্ছ, অনর্থক;
পরিত্যক্ত, বিবর্ণ পুতুল—
ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, আর
কয়েকটি হাড়—
এ-ই আমি, এ-ই আমি। তাই বলি
বলি বার-বার,
'অপেক্ষা শেখাও,
শেখাও ধৈর্যের নীরবতা,
এ-বিশ্বে ফিরায়ে দাও আদিম মহিমা।
আমার ইচ্ছার
চক্র থেকে মুক্ত করো সূর্য, চন্দ্র, সমুদ্র, পাহাড়,
তারার জ্বলন্ত নৃত্য, পৃথিবীতে সবুজের খেলা,
আকাশের সোনালি-নীলের মেলা।
মুক্ত করো জন্ম, মৃত্যু ; আমার প্রেমেরে
প্রেমেরেও মুক্তি দাও ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে—'

আজ তোরে রেখে,
হে নবযৌবনা কন্যা, হে কন্যা আমার,
আমার প্রেমের মুক্তি। দেখি চেয়ে-চেয়ে—
আজিও করাল কাল ঘুমন্ত যেখানে—
পূর্ণিমা-মুখশ্রী তোর, পার্থিব অমরা।

তার জরা
সূর্যের মৃত্যুর মতো
নিশ্চিত, অথচ
অসম্ভব মনে হয় ; মনে হয়
কাল, তা-ও তুচ্ছ যেন, এ-বিশ্বের স্থবির ঘটনা,
রূপান্তরহীন।
লক্ষ রাত্রি, লক্ষ দিন
কেটে যায়—না কি আসে ফিরে-ফিরে
মৃত্তিকার মূর্তি দিতে চিরন্তনী দময়ন্তীরে ?

গঙ্গা

হেমচন্দ্র বাগ্‌চী

আমার মন টানে সেই গঙ্গা—
যা'র একধারে উঁচু পাড়, আর একধারে মটরের ক্ষেত ;
মাঝে মাঝে বাব্‌লা গাছের জিরিজিরি পাতা,—
হল্‌দবরণ ফুল।
বর্ষা যখন আসে,
তখন কালো পালের মত মেঘ ভেসে যায়!
গঙ্গা যেখান থেকে বাঁক নিয়েছে,
সেই দিক্‌সীমার পার থেকে উঠে আসে মেঘ,
তারপর ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত আকাশে!
ভোরের অস্পষ্ট অন্ধকারে
এক ফালি রূপার পাতের মত গঙ্গা,
চারিপাশে অন্ধকার,
মাঝখানে স্রোত,
তা'র আদি নেই, অন্ত নেই—
শুধু যতটুকু আমার সম্মুখে
আমার দৃষ্টির সীমার মধ্যে
ততটুকুকে দেখি রজতধারার মত,
সে বৈশাখের গঙ্গা,
স্বচ্ছ স্রোত,
ভোরের আধ আলোতেও তা'র নীচের বালি চোখে পড়ে।
কৃষাণ পার হয়ে যায় সেই গঙ্গা,
টোকা মাথায় গরু নিয়ে ;
পুরনো নৌকা ঘাটের উপর বালিতে প'ড়ে থাকে,

দূরে অসংখ্য বকের মেলা।
তা'দের যে মুখর সভা বসে,
সে সভা শেষ ক'রে
তা'রা মাঝে মাঝে দল বেঁধে উড়ে যায়—
তারপর
লঘু ভাবনার মত খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে যায়,
স্বচ্ছ জলে পড়ে তা'দের ছায়া!

কত রূপে দেখলাম তোমাকে, নদী,
হে ভৈরবী ওগো বৈরাগিণী,
এখানে তোমার মিলন—মহামিলন,
এখানে তাই তোমার আবর্ত্তস্রোত বেশী,
এখানে তুমি অধীর, চঞ্চল!
এখানে তুমি বিহ্বলার মত ঘুলিয়ে তুলেছে তোমার অন্তঃস্রোত—
মন্দির, জুটমিল, পড়ো বাড়ী,
পুরনো কতকালের বট, সুরকির কল, পচা বাঁশের গাদা,
গাদা বোট, ফেরি ষ্টীমার, সী-প্লেন,
আর ব্রিজের পর ব্রিজ,
মাঝিমাল্লার খেয়াপারাপারের তীব্রস্বর, চিম্‌নির ধোঁয়া—
এই সব নিয়ে বুকের উপর এবং দুইপাশে,
তুমি জোয়ার-ভাঁটার তালে তালে আন্দোলিত হচ্ছ!
অঞ্জলি ভ'রে নিলাম তোমার ঘোলা জল,
অনুভব কর্‌লাম তোমার দৃক্‌পাতহীন গতি—
মনে হ'ল আমার অনুভূতির মধ্যে
যে চলমান মুহূর্ত্তগুলি, সেগুলি যেন

তোমার আবর্ত্তিত স্রোতঃপরমাণুর মধ্যে রূপ নিল,
হে মহাকালী,
সে মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত অন্তরমূর্ত্তি রোমাঞ্চিত হ'ল!
অন্ধ নিয়তির মত এই অন্ধ গতি,
কিন্তু তোমার মধ্যে অনুভব কর্‌লাম সেই গতির অবারিত আলোক,
তা'র বৃহৎ পরিণাম!
এরা যেন পাল্লা দিয়েছে তোমার সঙ্গে,
এই চিম্‌নি, মোটার, ট্রেন, ব্রিজ, মন্দির-মঠ, ষ্টীমার;
মহামানুষের মহাব্যস্ততার এই রূপ!
তবু আমার মন টানে সেই গঙ্গা—
যার একধারে উঁচু পাড়,
আর একধারে মটরের ক্ষেতে,
মাঝে মাঝে বাবলাগাছের জিরিজিরি পাতা,
হলুদবরণ ফুল, আর,
যা'র স্বচ্ছ জলে ভাসমান লঘু মেঘের ছায়া!

ক্যালকাটা রোডে

প্রমথনাথ বিশী

ঘুরিতেছিলাম 'ম্যালে', দারজিলিঙের
বিখ্যাত সে রঙ্গমঞ্চে, যেখানে ভিড়ের
আবিল আনাগোনায় নিরীহ পথিক
না পায় সঙ্কীর্ণ পথ; ভুলে' দিগ্বিদিক্
'ফগ'-খোর স্বাস্থ্যলোভী ঘোরে বন্ বন্;
কে কতটা 'ফগ' খেলো যেথা সম্ভাষণ
একমাত্র। তিন-কাল-গত সব নারী
চলে যৌবনের চালে। টুপি আর শাড়ি
বাহুতে বাহুতে বদ্ধ ভ্রাম্যমাণ; আর
ঘোড়ায় চড়িয়া নাচে আনাড়ি সোয়ার
তালে ও বেতালে; বাঁকা ঠোঁটে ভাঙা ভাঙা
ফেরঙ্গ ভাষণ; বলি-চিহ্ন গাল রাঙা
লজ্জায় ও রাগে; কেহ ঘোড়া হ'তে নেমে,
পাকচক্রে ক্লান্ত কেহ মাঝখানে থেমে,
পাহাড়ীর কাছে কেনে সিকিমি আপেল;
কেনে আর খায় কেনে; আস্ত যেন বেল
এত বড়: খায় আর বকিছে বর্ব্বর
নিরর্থক; দূরাগত রেডিওর স্বর
অদৃশ্য আঙুলে মলি কান করে লাল।
স্বাস্থ্যের সে রঙ। চলে সকাল বিকাল
এই মত একভাব।
ছড়ায় কুজ্ঝটি
মলমল যবনিকা ধীরে/ হে ধূর্জ্জটি

আছে তব নন্দী ভৃঙ্গী আর কেন সখ ?
এদের বানাও কেন বৃথা বিদূষক ।

সঙ্গীরে ফেলিয়া পিছে চলিলাম একা
ক্যালকাটা রোড ধরে' ; এই পথ রেখা
মোর চিরপরিচিত আর অতি প্রিয় ,
নিরীহ পথিক পারে মনে মনে স্বীয়
কল্পনারে অনুসরি যতদূর খুসি
চলে যেতে চক্ষু বুঁজে ; উঠিবে'না রুষি
অন্য কোন পথচারী ; জুড়ালো শ্রবণ,
জুড়াইল সর্ব্বদেহ, জুড়ালো নয়ন ।
বাস্তবের বল্গা ছাড়ি কল্পনার হাতে
চলিয়াছি অন্য মনে গিরির ছায়াতে ।
অকলঙ্ক আকাশের নীলকান্ত থালে
কাহার নৈবেদ্য লাগি আজি কে সাজালে
সোনার তবকে-মোড়া এই দিন খানি !
ইন্দ্রাণীর হার-ছিন্ন (কেমনে না জানি)
পড়ন্ত হীরক এ যে মহাশূন্য পথে !
অঙ্গুলি-বিদ্যুৎ এ যে সেই অঙ্গুরিকা
মুহূর্ত্তের তরে হানি বিদ্যুতের লিখা
পড়িছে অতল জলে ! এই ডুবে গেল—
মিলালো, নিভিল, দ্যুতি ! অন্ধকার ! এলো
অকস্মাৎ কুজ্ঝটিকা কপোত-ধূসর ।
রাশি, রাশি, পুঞ্জ, পুঞ্জ, বাষ্পীয় শীকর
পশিল নাশায় কর্ণে, বেড়িল আমারে

সৃষ্টিপূর্ব্ব সরীসৃপ আদিম আঁধারে ।
আর চলা অসম্ভব ; অনুমান ভরে
পান্থপার্শ্বস্থায়ী এক বেঞ্চির উপরে
বসিলাম সন্তর্পণে ; নিদৃশ্য জগৎ,
না যায় বেঞ্চিটা দেখা, নাহি দেখি পথ ।
দিগ্বিহীন অন্ধকারে মন এল ফিরে
শীর্ণ শাখা পঞ্জরের শূন্য এই নীড়ে
পরিশ্রান্ত । বসিলাম আমি আর মন ;
স্মরণের শতরঞ্চ-ক্রীড়া আয়োজন
আরম্ভিল । বলিলাম—বল দেখি আজ
(নীরন্ধ্র এ অন্ধকারে নাহি চক্ষু লাজ)
সব চেয়ে বেশি ভাল বেসেছ কাহারে ?
মন বলে—এই দেখ সপ্ত পারাবারে
ঘেরা এই বসুন্ধরা ; তাই বলে তার
জল তলে ভেদ নাই ! ডুবে মরিবার
পক্ষে যথেষ্ট সবাই ! ভাল মন্দ তব
বুঝিতে পারি না আমি ; বড় অভিনব
মনে হয় । বলিলাম—দেখাও আমারে ;
স্মৃতির শোভাযাত্রায় যাক্ সারে সারে
জীবন সূর্য্যায়ণের নক্ষত্রের রাশি ।

চেতনার রুদ্ধ উৎস হঠাৎ উদ্ভাসি
উৎসারিল শতধারে । কত ভোলা মুখ,
কত ভোলা নাম, আর কত ভোলা সুখ
দুঃখের শুক্তির মাঝে কাহারো নয়ন

মিনতি-করুণ, আর কাহারো বসন
সরমে অরুণ ; আর কারো বা কাঁকণ
বাজে রুন রুন ; আর কাহারো গুণ্ঠন
তমাল-তরুণ ; সব শেষে এলো সে যে
ধীর ভীরু পদে, অশ্রুর শিশিরে মেজে
মুখখানি। উর্দ্ধে নিল আমারে ছিনায়ে
সুদূর মানসে যেথা আদিম কুলায়ে
ব্যাকুল বলাকাদল চাহে বারম্বার
কৈলাস শিখরে কবে গলিবে নীহার
বসন্তের করাঘাতে ; উষ্ণ স্বরভিতে
আমারে বেষ্টন করি নিল চারিভিতে
সুকোমল পক্ষপুটে হংসদূত যেন।
বলিলাম—হায় মন বৃথা তুমি কেন
থামিলে এমন স্থানে ! হাসিল সে শুধু।
বিস্মৃতির বৈতরণী তীর করে ধূ ধূ
নিস্তব্ধ নির্জ্জন রিক্ত ! ভাবিলাম হায়
একবার সে যদি রে আসিত হেথায় !

স্বচ্ছ হ'য়ে এল ক্রমে ঘন কুহেলিকা,
একে একে প্রকাশিল আলোকের লিখা
এধারে ওধারে ; আমার বেঞ্চির পরে,
আর প্রান্তে, হেরিলাম বিস্ময়ের ভরে
নারী মূর্ত্তি এক ; যেন মেঘ লোক হ'তে,
স্বপ্নলোক হ'তে কিম্বা এল শূন্য পথে,
(দোহাই রবীন্দ্রনাথ করিনি নকল

গল্প-গুচ্ছ হ'তে তব, প্রায় অবিকল
বলিতেছি সেদিন যা ঘটেছিল সব।)
নহে বদাউন-কন্যা, আরো অসম্ভব,
যাহারে স্মরিতেছিনু, অর্থাৎ অতসী,
আমারি বেঞ্চির প্রান্তে অন্যমনে বসি।
'এখানে কেমন করে ?' দুজনে চমকি
শুধালাম যুগপৎ। নেত্র চকমকি
বরষিল কৌতুক কণিকা ; বলিল সে—
'স্বাস্থ্যের সন্ধানে আসিয়াছি।' 'একা বসে
এ নির্জ্জনে।' 'পথশ্রান্ত, তাই এ বিশ্রাম।'
বলিল সে কত কথা, আমি বলিলাম।
অতসীর সনে মোর ছিল পরিচয়,
বন্ধুরা বিদ্রূপ করি বলিত প্রণয়।
তার পরে একদিন ছ'বছর আগে,
(কত দীর্ঘ, তবু আজ কত হ্রস্ব লাগে !)
দুজনারে দুই দিকে খর কর্ম্মস্রোতে
নিয়ে গেল ছিন্ন করি ; সেই দিন হ'তে
দুজনের কাছে মোরা হয়েছি অজ্ঞাত
আর আজ দেখা এই হেন অকস্মাৎ !
সেই হ'তে খোঁজ কভু পাইনি কো তার,
সংসারসমুদ্র ধীরে দুরন্ত ভাটার
দুর্নিবার আকর্ষণে নিয়ে গেছে টেনে ;
শূন্যতটে শুক্তি সারি রৌদ্রশূল হেনে
ভূ-বিন্যস্ত। কোথা গেল, রয়েছে কেমন
জানি নাই, শুনি নাই ; আজো মোর মন

তুলিল না প্রশ্ন কোন।   আসন্ন বিরহী
নিশান্ত সমীরস্পর্শে যথা রহি রহি
চমকিয়া ওঠে তবু পারে না চাহিতে
পূর্ব্ব বাতায়নে, পাছে রঙের ইঙ্গিতে
ভাঙে স্বপ্ন, ভাঙে নেশা!   তেমনি আমার
দশা!   পাছে রাগচ্ছটা সীমন্তে তাহার
চোখ পড়ে!   ভাবিলাম—আক্ষেপ বৃথাই
হাতে হাতে মেলে যাহা যথেষ্ট যে তাই!

দুজনে মূঢ়ের মত রহিলাম বসি—
সুগভীর উপত্যকা দিতেছে নিঃশ্বসি
পুঞ্জ পুঞ্জ রুদ্ধ বাষ্প আকাশের চোখে—
যে কথা যায় না বলা, মেঘায়িত শ্লোকে
কুণ্ডলিয়া উঠিতেছে দূর স্বর্গ পানে।
আদি কবি হিমাদ্রির ভাষাহীন গানে
মিলিল মোদের কথা!

দেখিলাম চেয়ে
ক্রমনিম্ন পাহাড়ের গাত্র বেয়ে বেয়ে
সর্পিল পথের রেখাখানি; সুগভীর
উপত্যকা; শুধু শাল সরলের শির
পরিদৃশ্য, দিবসে ভালুক হোথা চরে,
বৃক্ষের বল্কল হ'তে স্নিগ্ধ রস ঝরে
নখর আঘাতে তার: নির্ঝর ঝর্ঝর,
ঝিল্লির ঝঙ্কার আর পত্রের মর্ম্মর।

অতসীরে শুধালাম—'মনে আছে সেই
তারা দেখা?'   হাসিল সে, অর্থাৎ যে 'নেই

সে কি হ'তে পারে!'

গানের আসরে মোরা
মিলিতাম; নীচে গান, ঊর্দ্ধে নভ-জোড়া
তারকিত অন্ধকার; কেবা শোনে গান!
হঠাৎ চাহিয়া দেখি তাহার নয়ান
বদ্ধ মোর আঁখি তারকায়; ধরা পড়ে'
ফিরাইয়া চক্ষুযুগ আকাশের পরে
খুঁজিত দক্ষিণ দিকে ধ্রুব তারকায়!
তাহার অমনোযোগে আমি ধ্যানীপ্রায়
হেরিতাম তার দুটি নেত্র জল-জ্বল,
সে যে শেফালি-সরল, তমাল-তরল,
তুফান-জাগানো সে যে, পরশ মাণিক
সোনা করে' দিত মোর যত দশদিক্
হৃদয়ের।   অকস্মাৎ নামাতো সে চোখ,
দুয়ের দৃষ্টিতে ঠুকে বরষিত শ্লোক
কৌতুক-স্ফুলিঙ্গ কণা; চলিত এমন;
কি গান হইত খোঁজ রাখে কোন জন।

আবার ঘিরিয়া এল ঘন কুজ্ঝটিকা;
ভাঙে ভেজা বস্ত্র দিয়ে বিশ্বছবি লিখা
আনন্দে মুছিল নন্দী; নব পটপরে
আঁকিবে নূতন ছবি আগ্রহের ভরে
গিরিকন্যা।   মিলাইল উপত্যকা, বন,
শুধু কোন্ অন্ধকারে অমিত-বর্ষণ
তালে তালে নির্ঝরের মত্ত কলরোল
—স্তব্ধতার রক্তের কল্লোল।

বিশ্বগ্রাসী সে তিমিরে দুইটি আঙুল
পরশিল পরস্পরে অকস্মাৎ! ভুল!
যে-সংস্কারের পটে ভুল, ভ্রান্তি, ভয়,
ক্ষণেকের তরে তাহা পেয়েছে বিলয়।

শুধালাম—'মনে পড়ে সেদিনের কথা
বারেক দেখার লাগি কত সে ব্যস্ততা
দুজনের!' কহিল সে—'কথা পুরাতন।'
পুরাতন বটে পুরাতন!
যত পুরাতন এই নদ নদী বন,
যত পুরাতন এই গিরি হিমালয়,
যত পুরাতন গিরি-কন্যার প্রণয়,
যত পুরাতন এই মানব হৃদয়।
অনন্ত তুষার পটে থাক্ শুধু লেখা
এইখানে আমাদের হ'য়েছিল দেখা
এই পুরাতন সত্য।

মিলালো কুয়াশা।
দেখিলাম, এদিকেও ক্রমে যাওয়া-আসা
করিছে পথিক। দেখিলাম দুইজন
দু'দিক হইতে আসে করি অন্বেষণ
আমাদের। যুগপৎ দাঁড়ালাম উঠি;
বলিলাম অতসীরে (স্বপ্ন গেল ছুটি!)
'পরিচয় করায়ে দি পত্নী মোর ইনি।'
অতসী কহিল মোরে (বাজিল কিঙ্কিনী)
দেখায়ে অপর জনে—'ইনি মোর স্বামী।'
নীলাইয়া উপত্যকা বৃষ্টি এল নামি॥

সময় কাটে না
(শ্রীযুক্ত সমর সেন-কে)

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সময় কাটে না।
খরশব্দ ক্ষিপ্রদিন
শুদ্ধ শূন্য রাত্রি অন্ধকার।

এখানে নেমেছে আজ শরতের সোনার বিকাল
শীতের শিশির-দেশে যাত্রী দিন মেলিয়াছে পাল
তীব্র শাদা মেঘে।
সূর্য্য, তুমি খাসা তীরন্দাজ
প্রশান্ত সন্ধ্যায় দেখি জীবনের পেয়েছি আন্দাজ।

মহিষের মন্থরতা: দেউলিয়া রাত্রি ঘন হয়
স্তব্ধ তীক্ষ্ণ তুষারের হবে কি প্রলয়?
পথিক পৃথিবী শুধু ক্লান্তি রোমন্থনে
নিতান্ত অলস, তবু শেষ দিন গোনে।

আকাশের আদালতে ফেরারি তারার
কোনো খোঁজ নেই আজ আর।
সোনার বিকাল গেল, বিশাল বিকাল গেল
রাত্রি হল ক্ষুব্ধ স্তব্ধ
নিঃস্ব শূন্যতার।

তুষারের হবে কি প্রলয় ?
দুঃসহ মিলন দিয়ে আমাদের প্রণয় তো নয় !
বাসনা-বিহ্বল ক্লান্তি নিরক্ষর সূর্য্য জানে না তো
আমাদের মতো ।
কামনা-পিচ্ছিল দিন বিবস্ত্র প্রহর
শান্ত চোখ, নীল বন্যা, ধূসর সহর ।
কোমল পল্লব আর জনতা বিশাল
তারার মশাল আর স্তব্ধ মহাকাল ।
কত দেরি, কত দূর, যাবে আজ চেনা ?
সময় কাটে না ।

বর্ষা

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কবিতা বর্ষার
ধরাতল স্নিগ্ধ করে নবীন আসার ।
কবিরা কূজন করে
কালিদাসী ঐতিহ্যের পুরা স্মৃতি ধরে' ।
এখনো ছাইয়া আসে
বঙ্গ উপসাগরের প্রান্তবাসী মৌসুমী হাওয়া
আর প্রমত্ত নিঃশ্বাসে
হলুদ দড়িতে বাঁধা কালো হাতী দল-ছাড়া পাওয়া ।
রোমাঞ্চ সঘন
কাঁপায় দম্পতিজনে, সারা তনুমন
নেচে ওঠে দেখে
বন্ধহারা ঝঞ্ঝাবৃষ্টি গাঢ়বদ্ধ বাহুপাশে থেকে ।

আর আসে হায়—
অস্বস্তির অনুষঙ্গ মোটা চাঁদা বন্যার খাতায় ।
ছেঁড়া কাঁথা 'পরে
গরীব চাষারা শোনে সকাতর দাদুরীর ডাক ;
বরিষা-বিভল নয় : অন্ধকারে সর্প বিহরে,
কাব্যমেদী প্রাণ নিয়ে বাস্তবের মসৃণ স্বপাক ।

বিস্ময়

জীবনানন্দ দাশ

কখনো বা মৃত জনমানবের দেশে
দেখা যাবে বসেছে কৃষাণ :
মৃত্তিকা-ধূসর মাথা
আপ্ত বিশ্বাসে চক্ষুষ্মান।

কখনো ফুরুনো ক্ষেতে দাঁড়ায়েছে
সজারুর গর্ত্তের কাছে ;
সেও যেন বাবলার কাণ্ড এক
অঘ্রাণের পৃথিবীর কাছে।

সহসা দেখেছি তারে দিনশেষে :
মুখে তার সব প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিহত ;
চাঁদের ও পিঠ থেকে নেমেছে এ পৃথিবী
অন্ধকার ন্যুব্জতার মত।

সে যেন প্রস্তরখণ্ড—স্থির—
নড়িতেছে পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তের সাথে ;
পুরাতন ছাতকুড়ো ঘ্রাণ দিয়ে
নবীন মাটির ঢেউ মাড়াতে মাড়াতে।

তুমি কি প্রভাতে জাগ ?
সন্ধ্যায় ফিরে যাও ঘরে ?
আস্তীর্ণ শতাব্দী ব'হে যায় নি কি
তোমার মৃত্তিকাঘন মাথার উপরে ?

কী তারা গিয়েছে দিয়ে—
নষ্ট ধান ?   উজ্জীবিত ধান ?
সুষুম্না নাড়ীর গতি—অজ্ঞাত ;
তবু আমি আরো অজ্ঞান

যখন দেখেছি চেয়ে কৃষাণকে
বিশীর্ণ পাগড়ী বেঁধে অস্তাক্ত আলোকে
গঙ্গাফেড়িঙের মত উদ্বাহু
মুকুর উঠেছে জেগে চোখে ;—

যেন এই মৃত্তিকার গর্ভ থেকে
অবিরাম চিন্তারাশি—নব নব নগরীর আবাসের থাম
জেগে ওঠে একবার ;
আর একবার ঐ হৃদয়ের হিম প্রাণায়াম।

সময় ঘড়ির কাছে রয়েছে অক্লান্তি শুধু ;
অবিরল গ্যাসে আলো জোনাকীতে আলো ;
কর্কট, মিথুন, মীন, কন্যা, তুলা ঘুরিতেছে ;—
আমাদের অমায়িক ক্ষুধা তবে কোথায় দাঁড়ালো।

শীত রাত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

দ্বারে-দ্বারে হানা দিলো নগ্ন হিম রাত।
আবরণ মুখে টেনে দাও
নিশীথিনী, অন্ধকারে কদম্বের রোমাঞ্চ ছড়াও
আনো মনে উর্ব্বশীর স্মৃতি-সাগরের
পলাতকা শেষ পদপাত।

আসঙ্গ লোলুপ আশা
হারায়েছে দীপ-রশ্মি রক্ততপ্ত বিকাশের ভাষা,
এ রজনী কুয়াশা-স্থবির,
এ হৃদয় কুয়াশা-স্থবির।

বিপর্যস্ত কৃষ্ণচূড়া অরণ্যেরও আসন্ন দুর্দ্দিন,
শস্যক্ষেত্র রিক্ত শস্যহীন।
চাদরেতে মুখ ঢেকে ধুরন্ধর গোয়েন্দারা ঘোরে
অন্ধকারে শীতের প্রহরে,
জনগণ সম্মিলনে রক্তাভ পতাকা মাঠে বাতাসেতে নড়ে।

কণ্টকিত এই শীত রাতে
আমি রিক্ত, জরাজীর্ণ আবর্ত্তের মাঝে
একদৃষ্টে থাকি চেয়ে অন্ধকার প্রান্তরের দিকে ;
ক্ষীয়মাণ দেহে নামে ধূলিলিপ্ত অদ্ভুত জড়তা,
মনে হয় সঙ্কটের নাই আর শেষ
গন্তব্যের পাই না উদ্দেশ।

দৃষ্টি ক্রমে হ'য়ে আসে ফিকে,
মনে-মনে গেঁথে চলি পলাতক অতীতের বহু শতাব্দীর
ম্লান ইতিহাস
ছিন্নভিন্ন বহু স্মৃতি বহু বিস্মৃতির।

নতমুখে রুদ্ধকণ্ঠে বারে-বারে বলি,
এ রজনী কুয়াশা-স্থবির,
এ হৃদয় কুয়াশা-স্থবির,—
আবরণ মুখে টেনে দাও
নিশীথিনী, অন্ধকারে কদম্বের রোমাঞ্চ ছড়াও
আনো মনে উর্ব্বশীর স্মৃতি-সাগরের
পলাতকা শেষ পদপাত॥

পলাতকা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মনে হয় বেশ ত এসেছি।
এইখানে স্বাস্থ্যান্বেষী ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যায়
নাগরিক রোগগ্রস্ত আড়ষ্ট স্নায়ুরা
বিকৃত বিশ্রামে তবু শিথিল হয়েছে।
পূজোর ছুটির কটা দিন, দুর্লভ অলস কটা দিন
চোরকাঁটা ভরা মাঠে অসমান উঁচু-নীচু পথে
নিবিড় নিটোল অন্ধকার
—নাগরিক বন্ধ্যা আলো নয়।
মনে হয়
অদ্ভুত মায়া এ। সত্য আর অনৃতের
মৈথুন হেথায়। ঝিঁঝিঁদের একঘেয়ে ডাক
পুরোনো কুয়োর পাশে বুনো ফুল গাঢ় গন্ধময়।
মনে হয়
বেশ ত এসেছি কটা দিন।

স্নান শেষে কোমল তোমার তনু।
—"বেড়াতে যাবে না আজ?
কী যে তুমি ভাব দিন রাত?"
আমি শুধু ভাবি বসে—কটা দিন?
এই কটা দিন? এর পর
নির্দ্দিষ্ট প্রহরে পুনরায়
ফিরতি ট্রেনের ভিড়। মনের গুমোট,

অপব্যয়ের অনুশোচনা, আর
কয়লার গুঁড়ো। প্রতিদিন পুনরায়
ট্রামে বাসে সাড়ে দশটায়
নিরুপায় অগণন মধ্যবিত্ত পদক্ষেপ মাঝে
নিজেকে মেলানো।

পিঁজরার পোষা বাঘ একদিন স্বপ্ন দেখে বুঝি
দুরন্ত বনের?
—ওটা শুধু আফিমের ঘোর।

একটি পুতুল, তার চিন্তা, তার শাস্তি

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

মন্দ্রিত নীল নভে বিহার।
কম্প্র হৃদয়ে জানি তোমায়।
একদা দুজনে হেরি কোথায়
দিকপ্রান্তের রং বাহার।

যদি কোনদিন নীল পাথারে
তরঙ্গায়িত হৃদ জোয়ারে
বিভঙ্গ মন দু'কূলহারা
মেলেনাক ঠাঁই ডুবসাঁতারে
তখন সেদিন কোন ছায়ায়
কাটাব দিবস ফের মায়ায়?

ভয় নেই সখি! নব বিজ্ঞানে
অসাধ্য সাধ ঘটে কে না জানে।
জানি মুহূর্তে ছায়ানীপবনে
হেরিব আবার এই পৃথিবীরে।
এস গো তাহলে পাতি গিয়ে ফিরে
ঘর সংসার প্রিয় পরিজনে।

সঙ্গীত

আবুল হোসেন

দক্ষিণ পবনে
আনমনে
আমার গানের সুর ভাসায়ে দিলাম আজি
অনন্ত আকাশে।
এলোমেলো অগোছাল সাজি,
জলহারা পেঁজাতুলো মেঘ ভাসে
গাঢ় নীলিমায়,
অতল সমুদ্রে ক্ষুদ্র বুদ্বুদ কণিকা,
অনাগত আলোকের শিখা
কেঁপে কেঁপে ফেরে,
অনামী অজানা যত পথের ভিখারী দল
রিক্ত নিঃসম্বল,
ছেঁড়াখোঁড়া কাগজের কুচি কুচি সেই টুকরোগুলি,
সংখ্যাহীন নামহারা পথধূলি
ছুঁড়ে দিনু মহা শূন্যতায়।

আমি হাসি আমি কাঁদি আমি গান গাই
নিঃস্পৃহ সদাই।
জ্যোৎস্নার চৈত্র রাত্রি মোর মনে
গলাগলি হয়ে হাসে পূবালি পবনে,
শ্রাবণের শ্রান্তিহীন নিঃশব্দ বাদল
সে আমার গাঢ় অশ্রুজল,
নিমেষের বিজলী কণায়

সারা চোখে মুখে মোর প্রদীপ্তি ঘনায়,
টুক্‌রো টুক্‌রো মোর যত বসন্ত শ্রাবণ স্মৃতি,
যাত্রা কালবৈশাখীর মেঘে অবিরত;
ক্ষণিকের হেমন্তের সুস্নিগ্ধ প্রভাত,
শব্দহীন মন্ত্রমুগ্ধ হিমানী-শিশিরসিক্ত রাত,
কণা কণা গোধূলির সাজ ;
সুখ দুঃখ প্রেম ব্যথা বিরহ বেদনা রাঙা
সঙ্গীতের শ্বেতপদ্ম ভাসায়ে দিলাম আজ।

হে অজানা, নাহি নাহি জানি
অলক্ষ্যে প্রসারি পাণি
কোথা তুমি রহিয়াছ স্বপনে বিভোর।
তবু মোর
জীবনের আনন্দের ক্ষুদ্র কণাগুলি
অন্যমনে ভুলি
পাঠায়ে দিলাম নিরুদ্দেশে
গ্রহণ তুমি কি তারে করিবে না কভু ভালবেসে ?

পটভূমি

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

পীত গবাক্ষে সর্পিল বেণী দোলে।
ঘন শৃঙ্গারে পথচারী মন ভোলে।
যায় যাক্ ডুঁবে গম্ভীর রণরোলে
মেদিনী। ক্ষণিক ভোলালে ও পটভূমি॥

আর নয় দেরি, সাবধানী, চোখ বোঁজো।
কানে ঠাসো তুলো, পাতালে বিরাম খোঁজো।
আকাশ পৃথ্বী টলোমলো। চুলে গোঁজো
রক্তিম জবা। তান্ত্রিক পটভূমি॥

টিনের চালাতে চড়ুইএরা শুনি নাচে।
আত্মা আমার কি অমৃত খেয়ে বাঁচে।
ভাবি আর দেখি, করুণ বাংলা পাঁচে
প্রতিবেশিনীর মুখ। হীন পটভূমি॥

মেঘের তুলোয় সুতো কেটে কেটে কারা
নীল শাড়ী বোনে, স্বচ্ছ, সীমানাহারা।
খবর পেয়েছি, ট্রেঞ্চে গিয়েছে মারা
বন্ধু আমার। নিষ্ঠুর পটভূমি॥

পথে যেতে দেখি কঙ্কালসার গাছে
কালো কালো ফুল,—কাকগুলো বসে আছে।
পীতপ্রায় মাঠে বসেছে বুড়ীর কাছে
শীর্ণ বৃদ্ধ। জরিষ্ণু পটভূমি॥

কিস্তিশোধের বাস্তবতা

অমিতাভ ঘোষ

বস্তুতন্ত্রবাদী বিশ্ব স্বার্থসন্ধ সদা
সুবিস্তৃত সমাজের দুস্তর সাগরে,
উন্মথিছে বৈষম্যের লবণাক্ত জল
আর্ত্তের নিস্তার নাই তস্করের ডরে।

উদয়াস্ত ব্যর্থশ্রম এল অস্থিরতা
স্তবস্তুতি ব্যর্থ হল। প্রভুত্ব-বিলাসী
কর্ত্তৃপক্ষ দিল হায় বিস্তর লাঞ্ছনা
পৃষ্ঠে দিল পদাঘাত নিষ্ঠুর চাপ্‌রাশী।

তখন সূর্য্যাস্ত কাল। স্তিমিত আকাশ,
স্থবির গোধূলি নামে স্থানীয় নদীতে,
সমাধিস্থ জাহাজের নিস্তব্ধ প্রকাশ
মাস্তলের মহারণ্যে সুপ্ত নিভৃতিতে।

মস্তকে পড়িল ভাঙি স্তম্ভিত আকাশ
স্তূপীকৃত অভাবের স্তব্ধ কালো ছায়া,
স্থাবর সম্পত্তিহীন গৃহস্থজীবন
মনে হ'ল স্থিতিশূন্য অনিত্যের মায়া।

কী লাভ দুশ্চিন্তা পুষে অন্তরের মাঝে?
জাতিচ্যুত হয়ে শেষে সাজিনু বোষ্টোম্,—
কর্ম্মস্থল হতে করি' মন্থর প্রস্থান।
দিগন্তে তখন লুপ্ত সৌর জ্যোতিস্তোম্।

প্রশস্তি পত্রের তলে দস্তখত লিখে
বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত ন্যস্ত করিলাম
অদৃশ্য ভাগ্যের হস্তে। হে দেব নমস্তে,
বিস্মৃতির স্তূপে লুপ্ত কর সর্ব্বকাম।

স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যে আস্থা নাই, খাস্তা গজা কিনে
খেতে খেতে ভ্রমি একা রাস্তায় রাস্তায়
দুঃস্থ পরিবারবর্গ দূর বস্তি বুকে
দারিদ্র্যের অসুস্থতা ভুঞ্জিছে সস্তায়।

বেকারত্বে বেড়ে যায় বস্তা বস্তা ঋণ
পুস্তভাষী মহাজন রুস্তমের কাছে,
ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে কিস্তি শুধিবার দিন
স্বস্তির সান্ত্বনা নাই বাস্তবের কাছে।

সমস্ত জগত নাকি অবস্থার দাস?
শান্তি স্বস্ত্যয়ন করি শাস্ত্রের বিধানে,
সুস্থ মনে কিছুকাল নব ব্যবস্থায়
উদয়াস্ত খাটিলাম অস্থানে কুস্থানে।

স্ত্রৈণ নহি, তবু স্ত্রীর প্রশান্ত প্রার্থনা
চাই যে স্বস্তিকা মার্কা কস্তাপেড়ে শাড়ী,
উপার্জ্জিত সপ্তদশ পকেটস্থ টাকা
দুশ্চিন্তায় ব্যস্তমনে মিথ্যা নাড়িচাড়ি।

দৈর্ঘ্যপ্রস্থ্যে দারিদ্র্যের স্থিতিস্থাপকতা
চোস্তরূপে বাড়ায়েছে স্থায়ী পরিস্থিতি,
অসুস্থ আত্মায় কাঁদে কস্তাপেড়ে শাড়ী
অস্থির করেছে অন্নবস্ত্রাভাবভীতি।

আলোকস্তম্ভের তলে দাঁড়ায়ে স্তম্ভিত
শুনিত সহরসিন্ধু স্থাবর জঙ্গমে
মনে হ'ল পণ্যজীবী স্থূলোদর যত
ধনগর্ব্বে ধর্ষিতেছে বাণিজ্যসঙ্গমে।

অকস্মাৎ খিস্তি শুনে হেরিনু রুস্তমে
যষ্টিহস্তে দোস্ত মোর ধরিল গর্দ্দান,
নিরস্ত করিনু তারে ভয়ত্রস্ত মনে
পকেটস্থ সপ্তদশ মুদ্রা করি দান।

প্রাণভয়ে কিস্তি শুধি ধাতস্থ অন্তরে
রিক্তহস্তে সুসজ্জিত বস্ত্রালয় পানে—
শূন্য মনে হেরিলাম কস্তাপেড়ে শাড়ী
নিষ্প্রাণ 'শো'-কেসে কাঁদে সুপ্ত অভিমানে।

তিনটি কবিতা

অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী

ভীরু মেয়ে

বড়ো ভীরু মেয়ে তুমি, বড়ো ভীরু মেয়ে।
এই পথটুকু সোজা আসিতে পারো না?
ঐ তো তোমার ঘর, ঐ তো আমার,
মাঝে কেউ নাই।

বড়ো ভীরু মেয়ে তুমি, বড়ো ভীরু মেয়ে।
এইটুকু পথ সোজা আসিতে পারো না!
ওই তো তোমার প্রাণ, এই তো আমার,
মাঝে কেউ নাই!

এসেছে শরৎ

শ্রাবণ মুছেছে আঁখি,
এসেছে শরত।
আঁখিপাতা এখনো যে ভিজা,
মুখে তবু সোনালী কী হাসি!

আমার ঘর

আমার ঘর।
বারান্দায় নিশ্চুপ
ব'সে আছে দুটি পায়রা।
সম্মুখে আমলকী বন
সোনার রোদে ভিজা,
ঝিরঝিরে তার পাতার পিছনে
কম্পমান নীল আকাশ,
ফাঁকে ফাঁকে শাদা মেঘ
ফুলের মতো।
মিঠে রোদে গা এলিয়ে
একপাশে ঘুমিয়ে আছে প্রশান্ত প্রান্তর।

বঞ্চনা

বিষ্ণু দে

সূর্যাস্তের ছায়ায় বিরাট
মূর্তি ধরেছে বঞ্চনা।
নিজের ছায়ায় নিজে ভয় পাই,
ভাগ্য কুড়ায় গঞ্জনা।

হঠাৎ জীবন হাতপা ছড়ায়!
এই ভর ক'রে এসেছি আজ
সন্ধ্যার কূলে কালের চূড়ায়
উর্মিল নীলে ভেসেছে সাজ।

তোমাকে দেখেছি হে ভোজরাজের
পুতুল, আমার রঞ্জনা!
গ্রামছাড়া পথে রাঙা মাটি ঝামা,
গোষ্পদ নদী অঞ্জনা।

মৈত্রী সেজেছে পেশোয়াজ ছেড়ে
অহংকারেরই কর্মক্ষয়।
জনগণেশের কুবেরী কবলে
ডোবা তো মরীয়া প্রাণের ভয়।

আত্মম্ভরী হে যশোলিপ্সু
বিশ্বম্ভর বঞ্চনা।
মধুকৈটভে স্বরূপ দেখেছি,
ঐ মেদিনীতে কি সান্ত্বনা?

পলাতক

সমর সেন

কর্কশ রঙে ভরে গেল বিকেলের পৃথিবী,
অনেক কাক উৎকণ্ঠিত ফিরে এলো,
আসন্ন হেমন্তে
মৃত্যু সহসা ঝুঁকে পড়ে চারিধারে ;
নিঃসঙ্গ বট
যেন পূর্বপুরুষের শুদ্ধ প্রেত ।

পাহাড়ের পাথরে আমার নাম লিখো,
উদভ্রান্ত প্রাণ খোঁজে তিব্বতী শুদ্ধতা ।

রক্তহীন মুখ অন্ধকারে ঢেকে
চলে গেল দিন ।

বন্ধুর পাহাড়,
কুয়াসায় ভরেছে সাঁওতাল গ্রাম,
ভোর হল ভেবে ভ্রান্ত কাক মাঝে মাঝে ডাকে,
সে ডাক মুহূর্তে মিলায়
নিস্তরঙ্গ কালস্রোতে ।

কাব্যজিজ্ঞাসা (১)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কবি: সেদিনকার শাণিত ধার হারিয়েছি
হৃদয়ে শুধু স্মৃতির ভার, ভিড় শুধু
বেড়াই ঘুরে' পাড়ায় আপন খুসিমত,
লঘু মেঘের মতন তনু মেলে যদি ।

জন্মে আর জীবনে আর তৃপ্তি নেই
মরণে মধু সমাপ্তির ক্ষীণ আশা
সকলি, মানি, অলীক এই গ্রহলোকে
ইন্দ্রিয়ের ধাঁধায় বাঁধা শরীর, মন ।

নিরুদ্দেশে আকাশে বৃথা খুঁজি বাসা
আলোর কোনো চিহ্ন নেই চরাচরে
দিনের ভাঙা সেতুর শেষে পরপারে
সূর্য গেল,—মুখর ফের পান্থনীড় ।

কবিবান্ধবী : নিজেই নিজের ছায়ার পাশে
চম্‌কালে মিছে । নিজেকে চিনে
নামাও বন্যা পিপাসু ঘাসে,
রুক্ষ মাটিতে, মেঘলা দিনে ।

শুধুই ধূম্র ইচ্ছাধীনে
কতকাল মেঘ আকাশে ভাসে?
তাই বিষণ্ণ তোমাকে দেখে
হঠাৎ পেলাম ইসারা কোনো
হাল্‌কা-স্বভাব হৃদয় থেকে।

হে দিগ্‌ভ্রান্ত, আজকে শোনো
তোমাকে সঁপেছি শরীর, মনও
সেদিন চোখের মুকুরে রেখে।

ঘরছাড়া মন তোমার। কবে
চকিতে নির্খোজ পালাবে মাঠে
—তাই শঙ্কিত হৃদয়। তবে
দয়ালু বিধিও সঙ্গে হাঁটে।

যদি কিছুকাল যুগলে কাটে
ঘরমুখো মন তবেই হবে।
হে দিগ্‌ভ্রান্ত, আমি তো বুঝি—

তোমার জটিল হারানো পথে
বাতি যে ধ'রবো, সেটুকু পুঁজি
আলেয়ার নেই। আমার মতে,
এসো আজ এই জটিল পথে
ঠিকানা ব'দ্‌লে প্রণয় খুঁজি।

ব্যবধান

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

তোমারে বোঝার বুদ্ধি আজো মোরে দেয়নি বিধাতা।
তাই যবে চন্দ্রকান্ত নয়নের কৃষ্ণপক্ষ্ম পাতা
বিস্ফারি তাকাও তুমি মাঝে মাঝে মোর মুখপানে,
আমি আত্মহারা হই, সে-নিগূঢ় চাহনির মানে
ধরিতে পারি না; শুধু অনুষঙ্গে জাগে কত স্মৃতি:
কে কবে অমনি চেয়ে জাগতিক বঞ্চনার রীতি
আমারে শিখালো যেন; অমনি পল্লবঘন আঁখি
অমৃতের আশা দিয়ে পারিজাতকুঞ্জে মোরে ডাকি,
অনিকাম বিসংবাদে বারম্বার হলো পণ্ডশ্রম
পলাতক সন্ধিলগ্নে॥
একবার মাত্র ব্যতিক্রম
ঘটেছিলো সে-বিধির: হেমন্তের উর্দ্ধশ্বাস সাঁঝে
উদ্বাস্ত কালের পায়ে ঝিল্লীর মঞ্জীর যবে বাজে
আচ্ছন্ন মাঠের প্রান্তে, পরিব্যাপ্ত মৃত্যুর ছায়ায়
আগন্তুক তমস্বিনী আপনারে অচিরে হারায়,
নিস্তৈল দীপের মতো মানুষের নিরাশ্রয় মন
আছাড়ি বিছাড়ি নেবে, কোনো এক সন্ধ্যায় এমন—
যুগান্তে, জন্মান্তে যেন—শাপভ্রষ্ট কে এক উর্ব্বশী
অন্তর্দীপ্ত উল্কাসম করপুটে পড়েছিলো খসি
অধরার মূক বার্ত্তা মর্ত্ত্যরজে করিতে সঞ্চার।

কবিতা

পৌষ, ১৩৪৬

সে-দিনে মুহূর্ত্তকাল অবচ্ছিন্ন শরীর আমার
অম্লান, অনন্ত বীর্য্যে উঠেছিলো উচ্চকিত হয়ে,
অনাদ্য ওঙ্কারনাদে জেগেছিলো প্রতন-হৃদয়ে
চিরঞ্জীব পুরুরবা ॥
কিন্তু কোনো কথা কহে নি সে,
বলে নি আপন নাম, সনাতন অন্ধকারে মিশে
নিঃসঙ্কোচ জৈব ধর্ম্মে কল্পেছিলো মোরে সম্প্রদান
অনির্ব্বচনীয় তনু। ব্যষ্টির প্রাকৃত ব্যবধান
তাই তীর্ণ হয়েছিলো নির্ব্বাণের অখণ্ড শান্তিতে;
মোদের বিশ্লিষ্ট আত্মা জাতিস্মর দেহের ইঙ্গিতে
প্রাক্তন প্রবৃত্তিপথ খুঁজে পেয়েছিলো অকস্মাৎ;
অসম্ভূতির ঐক্যে ঘুচেছিলো বহুর ব্যাঘাত ॥

সে-দিব্য মিলনে তুমি অধিকার দাও নি আমারে।
তোমার বিশ্রদ্ধ বাক্য তাই মোর রুদ্ধ চিত্তদ্বারে
হানি বৃথা করাঘাত নিরন্তর ফিরে ফিরে যায়।
তোমার সান্নিধ্যে তাই ব'সে থাকি আমি মৌনপ্রায়
সৌজন্যের ঘটাটোপে আপনারে পাকে পাকে ঘিরে;
যে-দিকে তাকাই দেখি নিরাশ্বাস বুদ্ধির তিমিরে
মোদের বিয়োগধর্ম্মী চৈতন্যের চক্রচর কণা
স্বতন্ত্র জ্বালার কক্ষে নিরুপায়ে করে আনাগোনা।
তুমি চাও মোর মুখে, আমি তব মুখপানে চাই:
এই ভাবি বুঝিলাম, এই ভাবি কিছু বুঝি নাই ॥

নতুন কবিতা

শিলা-লিপি, মণীশ ঘটক প্রণীত। কবিতা-ভবন, দুই টাকা।

'কল্লোল' পত্রিকার একদা নটোরিয়াস লেখক যুবনাশ্ব সম্প্রতি ছদ্মনাম ছেড়ে আত্ম-নাম, ও গল্প ছেড়ে কবিতা লেখা ধরেছেন। গল্প তিনি আর লেখেন না— এমনকি, 'কল্লোলে'র গল্পগুলিও এখন পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেননি, এতে দুঃখিত না হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি তিনি যে কবিতা লিখছেন, এবং ৩৯টি কবিতা 'শিলা-লিপি' নাম দিয়ে বইয়ের আকারে বের করেছেন, এতে খুসি হবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ, তাঁর কবিতাগুলো উৎকর্ষের সেই স্তরে অন্তত পৌঁচেছে যাতে এই দুর্দিনেও গ্রন্থনের ব্যয় ও শ্রম স্বতঃই সার্থক; অর্থাৎ কবিতাগুলো যে আমরা পড়তে পেলাম এটা আমাদের সকলের সাধারণ লাভ। খদ্দরে বাঁধানো সুশ্রী এই বইখানা হাতে নিয়েই আপনার ভালো লাগবে, তারপর পাতাগুলো উল্টিয়ে গেলে এমন দু'চারটা লাইন নিশ্চয়ই চোখে পড়বে যাতে বিক্ষিপ্ত মনোযোগ হবে নিবিষ্ট; আর তারপর যদি চুপ ক'রে ব'সে বইখানা একটানা প'ড়ে যান তাহ'লে লেখকের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে আপনার মনে সন্দেহ থাকবে না।

অবশ্য কবিতার বই একটানা পড়বার জিনিস নয়; হাতের কাছে রেখে একটু-একটু ক'রে পড়লেই তার প্রতি সুবিচার করা হয়। বিভিন্ন সময়ে, ও মানসিক অবস্থায়, বিভিন্ন কবিতা ভালো লাগে, এ-অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। তাছাড়া, 'শিলা-লিপি'র কবিতাগুলিও প্রসঙ্গে ও আঙ্গিকে প্রায়ই বিভিন্ন। কিছু আছে ছন্দে, কিছু আছে গদ্যে, এবং এই দুই রীতি মিলে মিশেই আছে, তাদের আলাদা ক'রে দেয়া হয়নি। তার উপর আবার কোনো কবিতা ব্যঙ্গের, কোনোটি নিছক বর্ণনার, অন্য কোনোটি হৃদয়াবেগের। হৃদয়াবেগ না ব'লে শরীরাবেগ বললেই ভালো হয় কেননা মণীশবাবুর কবিতার 'সৃষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্বার, দুর্জয়।' তাঁর রচনায় 'কামনা' শব্দটিরও ছড়াছড়ি। তাঁর প্রেমের কবিতার মাংসলতায় বিমুখ হবেন না এমন পাঠক বাংলাদেশে নেই এ-আশা করবার সাহস হয় না, কিন্তু এটা উল্লেখযোগ্য যে এই আদিম বিষয় অবলম্বন ক'রেই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি ফুটেছে। নিঃসন্দেহে এ-বইয়ের শ্রেষ্ঠ

কবিতা 'পরমা' এবং আধুনিক কালে লেখা ভালো বাংলা কবিতার মধ্যেও এটি স্থান পায়। ছন্দের গাম্ভীর্যে ও শব্দচয়নের নির্ভুল নিপুণতায় এ-কবিতাটি প্রতিবেশীদের ছাড়িয়ে এক মাথা উঁচু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—

আর কেহ বুঝিবে না, তোমাতে আমাতে
এ বোঝা পড়ার পালা সাঙ্গ ক'রে যাবো আজ রাতে
অন্তরঙ্গ আলাপনে।
রাত্রির অঞ্চল সঞ্চালনে
শান্ততর, স্নিগ্ধতর হ'য়ে এলো বায়ু,
তৃতীয়ার চন্দ্রের প্রমায়ু
হোল শেষ। মেঘলোক হ'য়ে পার
ঘনিষ্ঠ আশ্লেষ রচে পরম আত্মীয় অন্ধকার।

এই নাটকীয় আরম্ভ পাঠকের মনকে বেশ একটা চড়া স্বরে বাঁধে, এবং সেখানে যে-প্রত্যাশা জাগায়, কবিতার বাকি অংশ তাকে অতৃপ্ত রাখে না। এই একই বিষয়ে বিবিধ বৈচিত্র্যের সন্ধান কবি করেছেন—ও পেয়েছেন। 'চিলে কোঠা' কবিতাটি গদ্য কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব'লে আমার মনে হ'লো। দেওঘরের ভৌগলিক পরিবেষ কবিতাটিকে নতুন রকমের একটি সৌরভ দিয়েছে। 'শালবনী', 'চিনি' ও 'একমাত্র' এ তিনটি গদ্য-কবিতাতেও অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তির শুভবিবাহ ঘটেছে, যদিও শেষেরটিতে কবির ডন জুয়ানি আত্ম-চরিত একটু নাটুকেপনা ব'লে মনে হয়। বস্তুত, নাটকীয় উক্তির দিকে কবির যে-আন্তরিক—ও প্রশংসনীয়— ঝোঁক তা কখনো-কখনো নাটুকেপনায় অধঃপতিত হয়েছে, বিশেষ ক'রে তিনি যেখানে অতি-প্রাকৃত কোনো আবহাওয়া সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। এই কারণে 'তোমার মমি' 'মৃত্যুময়ী' 'প্রেতোৎসব' এ-সব কবিতা আমার ভালো লাগলো না। মোটের উপর মনে হয় জীবনের ও প্রকৃতির মধুর ও সহজ দিকগুলিই তাঁর চৈতন্যের গভীরকে স্পর্শ করতে পারে (দৃষ্টান্ত: 'শালবনী', 'চিনি'), উচ্ছৃঙ্খল কি অতি-প্রাকৃত, ভয়ঙ্কর কি বিকৃতকে তিনি অনেকটা জোর ক'রেই তাঁর কাব্যের আসরে টানেন, ফল ভালো হয় না। অন্যপক্ষে, অসাবধান মুহূর্তে, কিংবা অনর্থক অনুপ্রাসের মোহে তাঁর সহজ জীবনানুরাগ সেন্টিমেন্টালিটির স্তরে নেমে এসেছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এ-বিষয়ে একটু অবহিত হ'লে—

আজ যারে ভালোবাসো প্রিয়া,
তাহারে বাসিয়ো ভালো, যেন কপটতা কালো মলিন না করে তব হিয়া।

কিংবা

নিভে আসে আলো নয়নের সীমানায়
নভোতল নীল নিষ্ফল নিরাশায়।
নিঃসীম নিঃসঙ্গ নীরব নিশা,
শিহরে সভয়ে সমীরণ হারাদিশা।

এ-ধরণের অযোগ্য শব্দমালা তাঁর খ্যাতিকে মলিন করতে পারতো না। কারণ 'হারাদিশা' যদি বা সহ্য হয়, ন-এর কান-মলা সত্যি বড়ো কষ্টকর। অনুপ্রাসের টেকনিক মণীশবাবুর এখনো ঠিক আয়ত্ত হয়নি।

বস্তুত, বইখানা আগাগোড়া পড়লে কবিতাগুলির অসমানতা বোধ হয় যে-কোনো পাঠকেরই চোখে ঠেকবে। মনে হয়, মণীশবাবুর রচনা থেকে এখনো দৈবের হাত লুপ্ত হয়নি, অর্থাৎ কোনো-কোনো কবিতা যেন তাঁর নিজেরই অজ্ঞান্তে সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হচ্ছে, নিজের সম্বন্ধে তিনি যেন নিশ্চিত নন। অবশ্য এ-কথা বলাই বাহুল্য যে এমন কোনো কবি নেই যাঁর সব কবিতাই সমান ভালো, তবে যাঁর খারাপ লেখাগুলিও অন্তত নৈপুণ্যধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয় না, তিনিই ভালো কবি। আঙ্গিকের চর্চার মূল্য এইখানেই। কবিতার কলা-কৌশল যাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত, তিনি ভালো কবিতা যখন লিখতে পারবেন না, তখনও ভালো পদ্য লিখবেন। মণীশবাবুর মধ্যে কবিত্বের যে-উপাদান আছে, তাকে আত্ম-শাসনে সংহত ক'রে আনলে কবিতা ভালো হওয়া দৈব ঘটনা না হ'য়ে অনেকটা নিজের ইচ্ছাধীন হ'তে পারে।

আমার ছিদ্রান্বেষণ এখানেই শেষ। আসল কথা এই যে মণীশবাবু কবিত্ব-শক্তির অধিকারী, এবং সে-শক্তি নিজেই নিজের পথ ক'রে নেবে এ-কথাও নিঃসন্দেহ। লেখক নিজের রচনার প্রতি নির্মম হ'তে পারলে বইখানা হয়তো নিখুঁত হ'তো, এবং তার আর-একটা ফল হ'তো এই যে বিষয়হিসেবে স্ত্রীমাংসই প্রধান হ'য়ে উঠতো না। এখানে ব'লে রাখছি প্রসঙ্গ নিয়ে কদাচ আমি কলহ করিনে, তবে 'শিলালিপি'তে নারীদেহের পৌনঃপুনিক বর্ণনা খানিকটা

অপরিণত মনোভাবের পরিচয় দেয় ব'লেই এ-কথা বলতে হ'লো। মুখ-বদলানো হিসেবে 'চৈত্র-বেলা' সনেটটি আমার খুব ভালো লাগলো, সরলতায় ও প্রকৃতি-প্রেমে এটি প্রায় অজিত দত্তের লেখা হ'তে পারতো।

আমার বাগান ভরা প্যান্সি পপি ডালিয়ার মেলা
আমার আকাশ 'পরে করোজ্জ্বল অরুণের খেলা,

* * *

আমার পাখীরা সব ভিড় ক'রে ওড়ে আশেপাশে,
ঝুঁটিওলা লঙ্কা দুটি আমারেই বেশী ভালবাসে।

* * *

ও বাড়ীর বুলবুল, মাঝে মাঝে সেও আসে কাছে,
শপেদার কাটলেতে যত ঝিঁঝিঁ বাসা বাঁধিয়াছে।
একঘেয়ে সারিগানে চৈত্র-বেলা করে স্বপ্নাতুর,
থমকি দাঁড়ায়ে শোনে কাঠবেড়ালীরা সেই সুর।

এ-কবিতাটি চৈত্র বেলার অলস সৌরভে ভরপুর, যেমন কিনা শরতের আলো-ছায়া পড়েছে নিচের উদ্ধৃতিতে :

শরৎকালের থমকে থাকা একটি দিন।
রোদ নেই, অথচ ঘটা ক'রে মেঘও করে নি,
হাওয়া বন্ধ।......
অসমতল মাঠের কোণাকানছি দিয়ে
সারা বর্ষার জমা জল
ছল ছল ক'রে পড়চে।
কচিধানের বিচিত্র সবুজ সৌষ্ঠবে
ক্ষেত আলো।

গম্ভীর ও হালকা দু'রকম চালই মণীশবাবুর হাতে আসে, গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিতেই তিনি অভ্যস্ত, আরো দৃঢ়তা ও আত্ম-শাসন যখন তাঁর রচনায় দেখা দেবে, তখন আশা করি বর্তমান সমালোচকের এই খুঁতখুঁতানি হেতুহীন হ'য়ে পড়বে।

বুদ্ধদেব বসু

রবীন্দ্র-রচনাবলী

কবিদের শ্রেষ্ঠতার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ মাপবার কোনো দরজির ফিতে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু মহৎ কবি ও ভালো কবির, তারপর ভালো ও মন্দ কবির প্রভেদ নির্ণয় করা মানুষের বহু যুগের সাহিত্য সৃষ্টি ও চর্চার ফলে আজ অনেকটা সহজ হ'য়ে এসেছে। নবীন উদ্যমীদের সম্বন্ধে তুমুল মতদ্বৈধ যদিও অনিবার্য, কবির বয়ঃক্রম পঞ্চাশ পেরোলে পরে তিনি উপরি উক্ত তিন শ্রেণীর কোন শ্রেণীতে পড়েন সে-বিষয়ে অন্তত সমালোচকেরা নিঃসন্দেহ হ'তে ভরসা পান। সাহিত্য-সমালোচনারি যে উপায় ম্যাথ্যু আর্নল্ড ব'লে গিয়েছেন সেটাই সম্ভবত সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত; অর্থাৎ অতীতের মহৎ কবিদের সঙ্গে তুলনা দ্বারাই আধুনিক কবির মূল্যীকরণ হয়ে থাকে। বাল্মীকি, হোমর, দান্তে, শেক্সপিয়র প্রভৃতি কবিরা যে মহৎ, সে কথা অবশ্য স্বতঃসিদ্ধ, তা আর নতুন ক'রে প্রমাণ করবার দরকার করে না। সমালোচকের পরিশ্রম তাই অনেকটা বেঁচে যায়, এবং লাগসই উদ্ধৃতি দিতে পারলে ব্যাখ্যাও অনেক সময় বাহুল্য হয়ে পড়ে। ম্যাথ্যু আর্নল্ডী রীতির কার্য্যকারিতা অনস্বীকার্য, এর বিপদ শুধু একটি। অতীতের— অন্তত নিকটতম অতীতের—কাব্যের পটভূমিতে দেখলে প্রতিভাবান নবীন কবির উদ্যম বিকৃত কি চরিত্রহীন মনে হবার আশঙ্কা প্রবল, এবং সে-সমালোচক সত্যই বিরল, যাঁর দৃষ্টি অতীতের অভ্যাস ভেদ ক'রে ভবিষ্যতে পৌঁছতে পারে। সেইজন্যে এটা প্রায়ই দেখা যায় যে সমালোচকের কাজ যদিও ভালো লেখা চিনিয়ে দেয়া, সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁরা নিজেরাই হতচেতন। অতীতের

* রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। প্রায় ২৫ খণ্ডে সমাপ্য। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৪॥•, ৫॥•, ৬॥• ও ১০৲। প্রতি তিনমাসে এক-একটি খণ্ড প্রকাশিতব্য। প্রথম খণ্ডে আছে; 'সন্ধ্যা সংগীত', 'প্রভাত সংগীত', 'ছবি ও গান'; 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'রাজা ও রানী'; 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট'; য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'।

আদর্শ বর্তমানের উপর প্রয়োগ করতে গিয়েই এই ভুল আমরা ক'রে বসি। রবীন্দ্রনাথ যখন লিখতে আরম্ভ করেন, তখন বঙ্কিম প্রভৃতি দু'একজন প্রতিভাবান ছাড়া এমন সন্দেহ কারুরই মনে হয়নি যে এই লাজুক ও খাপছাড়া বালকটি অচিরে বাংলা সাহিত্যের নব জন্ম ঘটাবে। বাংলা সাহিত্যের পেশাদার ও প্রতিষ্ঠিত সমালোচকদের হাত থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন পর্যন্ত বিদ্রূপ ছাড়া আর-কিছু উপহার পাননি ; মধুসূদন কি ঈশ্বর গুপ্তের রীতির সঙ্গে যা একেবারেই মেলে না, তার মধ্যে কোনো সংগুণ আবিষ্কার করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিলো। ঈশ্বর গুপ্ত কি মধুসূদন পেরিয়ে বৈষ্ণব কবিতার দ্বারস্থ হ'লেই রবীন্দ্র-কাব্যের মর্মে প্রবেশ করা সহজ হতো, কিন্তু সাধারণত নিকটতম অতীতই সমালোচকের মন আচ্ছন্ন ক'রে থাকে ব'লে এরকম ভুল সাহিত্যের ইতিহাসে বারে-বারেই দেখা যায়। কিন্তু যে লেখক প্রতিভাবান ও বহুপ্রসবী, তাঁর রচনায় কালক্রমে অভ্যস্ত না-হওয়াও অসম্ভব ; এবং যে-অভিনবত্ব প্রথমে বর্বরতারই নামান্তর মনে হয় এমন সময় আসে যখন তার সতেজ দীপ্তিতে অতীতের সাহিত্যই বরং ফ্যাকাশে দেখায়। আরো কিছুদিন গেলে সেই একদা-অভিনবত্বই সাহিত্যিক সংস্কারে পরিণত হয়, এবং পরবর্তী সাহিত্য তার সঙ্গে না-মিললেই সমালোচকেরা নিন্দা করেন। সাহিত্যের ইতিহাসের নানারকম জটিলতার ভিতর থেকে এই একটি অন্তত পরিষ্কার নিয়ম উদ্ধার করা যায়।

বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাঙালি পাঠকসমাজ এতদূর বিরূপ ছিলো যে তাঁর বঙ্গবিজয় বোধ হয় তাঁর বিশ্ববিজয়ের পরবর্তী ঘটনা। এর মধ্যে ব্যক্তিগত কারণও হয়তো কিছু ছিলো ; আচারে ব্যবহারে, রীতিতে নীতিতে, এমন কি চেহারায় বেশভূষায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুররা ছিলেন সাধারণ বাঙালি সমাজ থেকে একটু স্বতন্ত্র ; এবং নিজেদের 'খাঁটি' বাঙালিত্ব নিয়ে যাঁরা গর্বিত ছিলেন তাঁরা যে এই ঠাকুরদের খুব ভালো চোখে দেখতেন না তা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' পড়লেই জানা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঈষৎ একটা অপ্রসন্ন ভাব তাঁর যৌবনের

সমসাময়িকরা অনেকেই তাই এড়াতে পারেন নি। কিন্তু নিরপেক্ষ কাল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো না, কবিরই জয় হ'লো।

রবীন্দ্রনাথ যে সেই বিরল মানবদের একজন, মহাকবি আখ্যা যাঁদের সম্বন্ধে সত্যই প্রযুজ্য, আজ আর এ নিয়ে কোনো তর্ক নেই। বস্তুত, গত কুড়ি বছর ধ'রেই এ-সত্যটি বাঙালি সমাজে প্রতিভাত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মহিমার কিন্তু একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি মহৎ তাঁর সমগ্রতায়। পৃথিবীর অন্যান্য মহাকবিকে স্মরণ করলে বুঝতে পারি বিক্ষিপ্ত রচনায় কি স্মরণীয় পংক্তিকে তাঁর মহত্ব নয়। রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হ'লে আর্নল্ড-অনুমোদিত সমালোচনার মাদুলি ব্যর্থ। বিচ্ছিন্ন পংক্তির চাইতে তাঁর সমগ্র কবিতাটি বড়ো, এবং যে-কোনো শ্রেষ্ঠ কবিতা বা কবিতা-সংগ্রহের চাইতে সমগ্র রচনাবলী বড়ো। এই কারণে কাব্যসংগ্রহে তাঁর প্রতি সুবিচার করা শক্ত, সমগ্রভাবে না-দেখলে তাঁকে ভালো ক'রে দেখা যায় না। এবং সমগ্রভাবে দেখলে এ কথা মানতেই হয় যে পৃথিবীতে তিনি অতুলনীয়। কথাটার মানে কী, তা ভালো ক'রে জেনেই বলছি। প্রথমত, এমন সার্বিক প্রতিভার পরিচয় পৃথিবীর অন্য কোনো লেখক কখনো দিয়েছেন ব'লে আমি জানিনে। তাঁর রচনাবলী এমন বিচিত্র ও অজস্র যে তার যে-কোনো একটি ক্ষুদ্র অংশ একজন লেখককে অম্লান গৌরবের অধিকারী করে। কবিতা ও গান, গল্প, উপন্যাস ও নাটক, প্রবন্ধ ও সমালোচনা, ভ্রমণ ও পত্র, ব্যঙ্গ-কৌতুক, শিশুপাঠ্য রচনা—গদ্যে ও পদ্যে উৎকর্ষের সঙ্গে এমন অফুরন্ত প্রাচুর্য আর কোথায় আমরা পাবো ? রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে, এই অজস্রতাই তাঁর মহত্ত্বের পরিমাণ—এত বেশি না-লিখলে এত বড়ো তিনি হ'তেন না। কোনো-কোনো লেখকের বেলায় দেখা যায় কয়েকটি প্রধান গ্রন্থ তাঁদের খ্যাতির নির্ভর ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে শুধু 'বলাকা', 'লিপিকা' 'ক্ষণিকা'র কি 'গল্পগুচ্ছ' ও প্রবন্ধাবলীর কি 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'র কি 'ঘরে বাইরে' ও 'গোরা'র লেখক হিসেবে দেখা অসম্ভব। শেক্সপিয়র-গ্রন্থাবলীতে 'কমেডি অব এরর্স' কি 'টেমিং অব দি শ্রু' যত তুচ্ছ, রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'সন্ধ্যা-সংগীত' কি 'প্রভাত-

সংগীত' মোটেও তত তুচ্ছ নয়। বস্তুত, প্রথম থেকে সুরু ক'রে ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের সব লেখা প'ড়ে গেলে সব চেয়ে অবাক হ'তে হয় গ্রন্থগুলির পারস্পরিক সংযোজনা লক্ষ্য ক'রে। যে-প্রতিভা হঠাৎ উদ্ভাসিত হ'য়ে দিগন্ত আলোকিত করে, তাঁর প্রতিভা সে-জাতের নয়। শেলি কি কীট্‌সের মতো তিনি প্রায় বালক বয়েসেই অপরূপ কবিতাবলী লেখেননি। তাঁর পরিণতি জীবদেহের পরিণতির মতোই মন্থর ও নিশ্চিত; সর্ববিষয়েই প্রকৃতিকে অনুসরণ করবার আশ্চর্য সংবুদ্ধি বালক বয়েস থেকেই তাঁর মধ্যে দেখা যায়। 'প্রডিজি' গোছের জীব তিনি কখনোই ছিলেন না। পূর্ববর্তীদের অনুকরণেই তাঁর সাহিত্য-জীবনের হাতে খড়ি। গদ্যে বঙ্কিমকে ও পদ্যে পুরোনো পয়ার ত্রিপদী নিয়েই তাঁর যাত্রা। তবে এ-অনুকরণ যে আরো সংকীর্ণ হয়নি তার কারণ বৃহৎ পরিবারের মধ্যে তিনি ছিলেন বয়োকনিষ্ঠ, অবজ্ঞাত ও নিঃসঙ্গ, সাহিত্যিক 'আবহাওয়া'র বহির্ভূত; আর তাই চুপচাপ একা ব'সে-ব'সে নিজের মনের খেয়াল ও কল্পনাকে ছন্দে বাঁধবার দুঃসাহস তাঁর হয়েছিলো। এটা যে দুঃসাহসের কাজ তা তিনি জানতেন না, জানতেন না যে এইভাবে বাংলা গীতিকবিতার তিনি জন্ম দিচ্ছেন। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'র সব ক'টি কবিতাই তৎকালীন প্রচলিত ঢিমে লয়ের পয়ারে, তিন মাত্রার ছন্দ এলো 'প্রভাত সঙ্গীতে', তাও যুক্তাক্ষরকে দু' মাত্রার মূল্য দেবার সাহস সঙ্গে-সঙ্গেই এলো না। 'ছবি ও গান' ছন্দের দিক দিয়ে অনেকটা অগ্রসর, কিন্তু 'রাহুর প্রেমে'র মতো উচ্চাভিলাষী কবিতাতেও পদে-পদে তিন মাত্রার ছন্দে যুক্তাক্ষরের বেড়ি পরানো। ছন্দের মুক্তি হ'লো আরো পরে; এবং যেদিন রবীন্দ্রনাথ অ-পয়ার ছন্দে যুক্তাক্ষরকে দু' মাত্রার মূল্য দিলেন, সেদিন থেকেই বাংলা ছন্দের বিপুল বৈচিত্র্যের সূত্রপাত। প্রতিষ্ঠিত ছন্দ ভেঙে তিনি নতুন ছন্দ সৃষ্টি করলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রধান কীর্তির মধ্যে এটি একটি।

রবীন্দ্রনাথের মন্থর পরিণতির দৃষ্টান্ত তাঁর গদ্যেও মেলে। বঙ্কিমের প্রভাব তাঁর উপর দুর্মর ছিলো। যদিও তিনি ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে কখনোই সাধুভাষা

ব্যবহার করেন নি, তবু গদ্য রচনায় তাঁকে চলতি ভাষা ধরানো শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীরই কীর্তি। 'সবুজ পত্রে'র আগেকার তাঁর সব রচনাই যেমন সাধু-ভাষায়, তেমনি 'চতুরঙ্গ'ই সাধু-ভাষায় তাঁর শেষ গ্রন্থ; চলতিভাষা একবার ধ'রে আর তিনি ছাড়েননি। 'বউ ঠাকুরানির হাট' আর 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র ভাষায় আকাশ-পাতাল তফাৎ; সতেরো বছর বয়েসে যিনি অমন ঝরঝরে সুন্দর চলতি গদ্য লিখতে পেরেছিলেন, তিনি যে জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সাধু-ভাষার কারাগার থেকে বেরোতে পারেননি এর কারণ খুঁজতে গেলে এ কথাই মনে হয় যে ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান তাঁর বরাবরই অত্যন্ত বেশি ছিলো। প্রসঙ্গত একটি কথা ব'লে রাখি। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'নিশ্চিত বলতে পারিনে, কিন্তু আমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে চলতি ভাষায় লেখা বই এই প্রথম।' এ কথা বলবার সময় তিনি নিশ্চয়ই 'হুতোম প্যাঁচা'র কথা ভুলে গিয়েছিলেন?

ভেবে দেখতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিপ্লবী বৃত্তি অনুপস্থিত, এ বিষয়ে তিনি মধুসূদনের ঠিক উল্টো। প্রচলিত প্রথাকে নির্মমভাবে অস্বীকার ক'রে আশ্চর্যরকম নতুন কিছু করবার আবেগ তাঁর প্রতিভার এঞ্জিনে কখনো ষ্টিম জোগায়নি। সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক কোনো জিনিসের মতো তাঁর প্রতিভা নিঃশব্দে ও প্রশান্তভাবে বেড়েছে, পৌঁচেছে চরম সিদ্ধিতে। তাঁর সাহিত্যের পরিণতি কোনো গাছের বেড়ে ওঠার মতো, যে-গাছ অতি ক্ষুদ্র আকার থেকে ধীরে ধীরে বিরাট বনস্পতির মূর্তি নেয়, তারপর পূর্ণতার দিনে অসংখ্য ডাল-পালায় লতাপাতায় একাই একটি অরণ্য হ'য়ে ওঠে। এ উপমা আর একদিক থেকেও সার্থক, কারণ রবীন্দ্রনাথের মূল সত্যই মাটির গভীরে বিস্তৃত। বিপ্লবী মধুসূদন বঙ্গভাষার ভেলা চ'ড়ে অকূলে পাড়ি দিয়েছিলেন; তাঁর বলশালী দস্যুতা ইওরোপে যে-উপনিবেশ গড়েছিলো, রবীন্দ্রনাথ তাকে আর বিস্তৃত করলেন না; বাংলা কবিতাকে তিনি ফিরিয়ে আনলেন বাংলারই জলে মাটিতে, বাউল গানের, বৈষ্ণব পদাবলীর সহজ সুরে, যা নিতান্তই স্থানীয়, এবং সেইজন্যেই সর্বদেশের ও

সর্বকালের। আমাদের স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি তিনিই। সত্যি বলতে, পৃথিবীর মহৎ কবিকুলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান অতুলনীয় শুদ্ধ এই কারণে যে তিনি একা, তাঁর এক জীবনের সাধনায় নিজের ভাষা ও সাহিত্যকে যেমন সর্বতোভাবে ও সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীর অন্য কোনো কবি তা করতে পারেননি। এত বড়ো কাজ যে একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব, তাঁকে চোখের সামনে না দেখলে আমরা বিশ্বাস করতে পারতুম না। কোনো সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ঘটনা আর দেখা যায় না। তাঁর চেয়ে বলশালী কল্পনা, গাঢ়তর আবেগ, মানবচরিত্রে সূক্ষ্মতর দৃষ্টি, কথার আরো গভীর জাদুকর ইঙ্গিতময়তা— পৃথিবীর সাহিত্য খুঁজলে হয়তো এ সবই পাওয়া যাবে, কিন্তু এ-কথা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি সম্বন্ধে বলা যায় না যে তিনি একা স্বদেশের ভাষা ও সাহিত্যের স্রষ্টা। তিনি একাধারে আমাদের আদি ও আধুনিকতম কবি, তিনিই প্রথম ও তিনিই শ্রেষ্ঠ। ছন্দ তিনি দিয়েছেন, গান তিনি দিয়েছেন, গদ্য তিনি দিয়েছেন; আজ আমরা যে ভাষায় কথা বলি ও লিখি, এ আমরা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। তাঁর দীর্ঘ জীবনেও আমরা সকলে ভাগ্যবান, কেননা তাঁর জীবনের রথ বারে বারেই তাঁর কীর্তিকে পিছনে ফেলে যায়। তিনি চির চঞ্চল, কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন না, তাঁর হাতে রীতি কখনো মুদ্রাদোষে অধঃপতিত হয় না, কেননা একটি রীতি একবারের বেশি তিনি ব্যবহার করেন না। তাঁর প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থ রীতিতে ও বিষয়বস্তুতে স্বতন্ত্র; নিজের কৃতিত্ব কখনো তাঁকে সম্মোহিত করেনি ব'লে 'ক্ষণিকা'র পর 'বলাকা' 'বলাকা'র পর 'লিপিকা', 'লিপিকা'র পর 'পুনশ্চ', অন্য দিকে 'গল্পগুচ্ছে'র পর 'ঘরে বাইরে' ও 'ঘরে বাইরে'র পর 'পয়লা নম্বর' সম্ভব হয়েছে। 'পুনশ্চ'র পর তাঁর যে কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিও আঙ্গিকের অভিনবত্বে উজ্জ্বল: অগাধ ঐশ্বর্যশালী সম্রাটের মতো সর্বদাই সঞ্চিত রত্ন উপেক্ষা ক'রে নবীন মণি আহরণে তাঁর উদ্যম। এইজন্যে, রবীন্দ্র-অনুকরণের মোহ কাটাতে যদিও নবীন কবিকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, রবীন্দ্রনাথকে কখনো আত্ম-অনুকরণের দোষ

স্পর্শ করেনি। এমনকি গানে, যার ক্ষুদ্র পরিসরে বৈচিত্র্যের জায়গা অল্প, সেখানেও পুরোনোকে ভেঙে নতুন বারে-বারেই দেখা দিয়েছে ব'লে তাঁর গানগুলির সদ্যোজাত অম্লানতা আমাদের অবাক করে। এইভাবে, ষাট বছরের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে, সাহিত্যের অজস্র রূপ ও রীতি, ভঙ্গি ও সুর তিনি সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভাবন করেছেন আঙ্গিকের অফুরন্ত কলাকৌশল, যা অবলম্বন ক'রে বাংলা সাহিত্য আজ ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে বিশ্বের সাহিত্য-অলকায় নিজস্ব মর্যাদার দাবি রাখে।

'রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী সংগৃহীত আকারে ভিন্ন-ভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করবার বিশ্বভারতীর এই উদ্যম প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালির হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্জন করবে। কবির নিজের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত এই ধরণের একটি প্রামাণ্য সংগৃহীত সংস্করণের প্রয়োজন বহুদিন ধ'রেই আমরা অনুভব করছিলাম। রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ড দেখে মনে হলো সে-প্রয়োজন এতদিনে মিটবে। এই সংস্করণটি একাধারে কাব্য-পারদর্শী ও সাধারণ পাঠকের উপভোগ্য। বইখানা দেখতে মর্যাদাবান, কিন্তু অন্যায়রকম গম্ভীর নয়; কবির নতুন ভূমিকাগুলি মূল্যবান, এবং সন্নিবিষ্ট ছবিগুলি অসংখ্য পাঠকের কৌতূহল ও বীর-পূজা-বৃত্তি চরিতার্থ করবে। পরিশেষে 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশ রবীন্দ্র-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হ'তে যাঁরা ইচ্ছুক, তাঁদের কাজে লাগবে, অথচ তার চেহারাটা এমন নয় যাতে সাধারণ পাঠক কাছে ঘেঁষতেই সাহস পাবে না। কালক্রমের নির্দেশে আবদ্ধ থেকেও রচনাগুলিকে কবিতা ও গান, নাটক ও প্রহসন, গল্প ও উপন্যাস, তারপর প্রবন্ধ এই চার অংশে ভাগ ক'রে বিশ্বভারতী একঘেয়েমির আশঙ্কা দূর করেছেন, যে-কোনো শ্রেণীর পাঠককেই আকর্ষণ করবার মতো কিছু উপাদান প্রতি খণ্ডেই থাকতে বাধ্য। এই গ্রন্থ এমনই লোভনীয় যে বাংলাদেশেও এর বহু সহস্র কাটতি হওয়া সম্ভব, এবং সে-হিসেবে প্রতি খণ্ডের ন্যূনতম মূল্য আরো কিছু কম করা যেতো। ২৫ খণ্ডে সমাপ্ত হ'লে সমগ্র রচনাবলীর ন্যূনতম মূল্য হয় ১১২॥০, এবং আমাদের দেশের পক্ষে এ-মূল্য অল্প নয়, তাছাড়া এ-গ্রন্থের বাহ্যিক

সৌষ্ঠবেরও সম-মূল্যের বিদেশী গ্রন্থাবলীর চমৎকারিত্বের সঙ্গে তুলনা হয় না। বিদেশী কবির গ্রন্থাবলীর সাধারণ সংস্করণের অপেক্ষাকৃত সুলভতার কারণ যদি প্রচুর কাটতিই হয়, আমি জোর ক'রেই বলতে পারি রবীন্দ্র-রচনাবলীও সর্বসাধারণের অধিগম্য হলে কাটতির অঙ্কে বাংলা বইয়ের জগতে দৃষ্টান্তস্থল হবে। পাব্লিক লাইব্রেরি, বিদ্বান ও ধনীসমাজ পেরিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য সমগ্রভাবে যাতে সর্বসাধারণের জীবনে স্থান পায়, এ-উদ্দেশ্য বিশ্বভারতীর মহৎ প্রচেষ্টার সঙ্গে বেমানান হতো না। আমার প্রস্তাব এই যে কোনো-এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতা ও গান এক সঙ্গে, ও সমস্ত গদ্য রচনা এক সঙ্গে, যথাক্রমে একটি কি দুটি খণ্ডে সুলভ মূল্যে প্রকাশ করা হোক; এখনও যে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত কবিতার এমন-কোনো সংস্করণ নেই, যা ধনী-গৃহের আসবাব না হ'য়ে সকলেরই প্রিয়তম পাঠ্য পুঁথি হ'তে পারে, এ-অভাব অবশ্য 'রবীন্দ্র রচনাবলী' দূর করতে পারবে না। আশা করি এ-বিষয়ে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় সচেষ্ট হবেন।

পরিশেষে একটি ক্ষুদ্র আপত্তি। এই রচনাবলীর পাতাগুলি কেটে দিলে ব্যস্ত পাঠককে অসহায়ভাবে টেবিল হাতড়াবার পর অনিপুণ আঙুল চালিয়ে সুদৃশ্য বইখানাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে হ'তো না।

বুদ্ধদেব বসু

কবিতা

পঞ্চম বর্ষ চৈত্র, ১৩৪৬ তৃতীয় সংখ্যা

বিপ্লব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডমরুতে নটরাজ বাজালেন তাণ্ডবে যে তাল
ছিন্ন করে দিল তার ছন্দ তব ঝংকৃত কিঙ্কিণী
হে নর্তিণী,
বেণীর বন্ধনমুক্ত উৎক্ষিপ্ত তোমার কেশজাল
ঝঞ্ঝার বাতাসে
উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম উচ্ছ্বাসে;
বিদীর্ণ বিদ্যুৎঘাতে তোমার বিহ্বল বিভাবরী
হে সুন্দরী।

সীমন্তের সীঁথি তব প্রবালে খচিত কণ্ঠহার
অন্ধকারে মগ্ন হোলো চৌদিকে বিক্ষিপ্ত অলংকার।
আভরণশূন্য রূপ
বোবা হয়ে আছে করি চুপ,
ভীষণ রিক্ততা তার
উৎসুক চক্ষুর পরে হানিছে আঘাত অবজ্ঞার।

নিষ্ঠুর নৃত্যের ছন্দে, মুগ্ধ হস্তে গাঁথা পুষ্পমালা
বিস্রস্ত দলিতদলে বিকীর্ণ করিছে রঙ্গশালা।
মোহমদে ফেনায়িত কানায় কানায়
যে পাত্রখানায়
মুক্ত হোত রসের প্লাবন,
মত্ততার শেষ পালা আজি সে করিছে উদ্‌যাপন।

যে অভিসারের পথে চেলাঞ্চলখানি
নিতে টানি
কম্পিত প্রদীপশিখা পরে
তার চিহ্ন পদপাতে লুপ্ত করি দিলে চিরতরে;
প্রান্তে তার ব্যর্থ বাঁশিরবে
প্রতীক্ষিত প্রত্যাশার বেদনা যে উপেক্ষিত হবে।

এ নহে তো ঔদাসীন্য, নহে ক্লান্তি, নহে বিস্মরণ,
ক্রুদ্ধ এ বিতৃষ্ণা তব মাধুর্যের প্রচণ্ড মরণ,
তোমার কটাক্ষ
দেয় তারি হিংস্র সাক্ষ্য

ঝলকে ঝলকে
পলকে পলকে,
বঙ্কিম নির্মম
মর্মভেদী তরবারী সম।

তবে তাই হোক,
ফুৎকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম আলোক।
চাহিব না ক্ষমা তব, করিব না দুর্বল বিনতি,
পুরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি,
অবজ্ঞা করিয়া পিপাসারে,
দলিয়া চরণতলে ক্রূর বালুকারে।

মাঝে মাঝে কটুস্বাদ দুখে
তীব্র রস দিতে ঢালি রজনীর অনিদ্র কৌতুকে
যবে তুমি ছিলে রহঃ সখী।
প্রেমেরি সে দানখানি, সে যেন কেতকী
রক্তরেখা এঁকে গায়ে
রক্ত স্রোতে মধু গন্ধ দিয়েছে মিশায়ে।

আজ তব নিঃশব্দ নীরস হাস্যবাণ
আমার ব্যথার কেন্দ্র করিছে সন্ধান।
সেই লক্ষ্য তব
কিছুতেই মেনে নাহি লব,
বক্ষ মোর এড়ায়ে সে যাবে শূন্যতলে.
যেথানে উল্কার আলো জ্বলে
ক্ষণিক বর্ষণে
অশুভ দর্শনে।

বেজে ওঠে ডঙ্কা, শঙ্কা শিহরায় নিশীথ গগনে,
হে নির্দয়া, কী সংকেত বিচ্ছুরিল স্খলিত কঙ্কণে॥

২১।১।৪০
উদীচী

তিনটি কবিতা

জীবনানন্দ দাশ

সন্ধিহীন, স্বাক্ষরবিহীন

কোথায় সূর্য্যের যেন নব নব জন্ম ঘিরে
মরণ উড়িতে আছে শ্বেত পারাবত ;
কোথাও নক্ষত্রহীন নিরাবিল রাত্রি নিয়ে
জীবন কি বৈতরণী-তরীর নাবিক ?
পারাবত, পারাবত, তোমার হৃদয়ে শুধু রক্তবর্ণ ক্ষুধা !
যেইখানে বর্ণহীন নিস্তব্ধতা তরঙ্গের প্রাণে কোনো অঙ্কুরের সুধা
ক্ষরিবে না কোনোদিন,—সব প্রীত ভ্রমণকে শান্তি দিয়ে
চিত্ত যার শুদ্ধ অশ্রুহীনতায় সৎ,
আমাদের জীবনের নব নব সূর্য্যগুলো কপোতকে দান ক'রে
আমরাও স্থির মেরু-নিশীথের নাবিকের মতন মহৎ
সততার দেখা পাব,—সন্ধিহীন, স্বাক্ষরবিহীন।

শান্তি

জীবন কি নীরক্ত সম্রাট এক সুধাখোর :
কূট ব্যবসায়ী নীল পার্শ্বচরগুলো তার মৃত্যুর উৎসব ?
মানুষের তরে তবে কোন্ পথ :
কোন্ অন্তরীক্ষে তারে নিয়ে যাবে আসন্ন সময় ?

সেইখানে বালুঘড়ি, বলো, তবে স্তব্ধতার মত :
একদিন আকাশের সাথে ঢের ধ্বনি বিনিময়
করেছিল ;—তারপর হয়ে গেছে আঁখিহীন—চুপ।
প্রান্তরের শুষ্ক ঘাসে যে সবুজ বাতাসের আশা
একদিন বলেছিল 'আবার করিব আমি অমৃত সঞ্চয়'—
শত শত মেষশাবকের আঁখিতারকাও পেল যেন ভয়।
শান্তি, শান্তি,—
উত্তেজিত শপথের উৎসারণ গ্রীহা ঘিরে থাকে না সতত,
বালুঘড়ি হয়ে থাকে চিরদিন স্তব্ধতার মত।

হে হৃদয়

হে হৃদয়, একদিন ছিলে তুমি নদী :
পারাপারহীন এক মোহানায় তরণীর ভিজে কাঠ
খুঁজিতেছে অন্ধকার স্তব্ধ মহোদধি।
তোমার নির্জ্জন পাল থেকে যদি মরণের জন্ম হয়
হে তরণী,
কোনো দূর পীত পৃথিবীর বুকে কাল্পনিক তবে
ঝর্ণার জল আজো ঢালুক নীরবে :
বিশীর্ণেরা আঁজলায় ভ'রে নিক সলিলের মুক্তা আর মণি :
অন্ধকার সাগরের মরণকে নিষ্ঠা দিয়ে,—উষালোকে মাইক্রোফোনের মত রবে।

শিল্পীর দৃষ্টিতে

হেমচন্দ্র বাগচী

শিল্পীর চোখে দেখতে শিখছি।
যখন তা' দেখিনি
তখন ?
তখন ছিল জড় বস্তুপুঞ্জ,
ছিল উদাসীনতা।

যখন দেখতে শিখছি,
তখন শুধু অনুরাগ
আর যোগ।
একনিবিষ্ট সাধনা।

আজ একটা শুকনো পাতার
সূক্ষ্ম রেখাগুলো
মনে চমক আনে।
মনে চমক আনে
পাশের বাড়ীর কার্নিশের
সমান্তরাল রেখা
কেমন সুন্দর একটি বাঁক নিয়ে
ঘুরে গিয়েছে।

চমৎকৃত হই,
পিছনের স্পষ্ট অস্পষ্ট স্থূলসূক্ষ্ম
অসংখ্য রেখার মধ্যে
স্পষ্ট প্রত্যক্ষ সম্মুখরেখা
নিয়েছে কেমন অদ্ভুত মূর্ত্তি—
সেই মূর্ত্তির রেখার সঙ্গে
পট-রেখার কি বিস্ময়কর সামঞ্জস্য!

* *

একখানি সাদা কাগজ,
আর ত নয় কিছুই
তার উপরে শুধু রেখা—
রেখার পর রেখা,
সেই রেখা কোথাও হ'য়ে উঠেছে উত্তাল
কোথাও ঢেউ-খেলানো উঁচু নীচু মাঠ
মিশেছে গিয়ে দিগন্তে,
তা'রই মধ্যে আলো-ছায়ার সঙ্কেত,
প্রসারিত রেখার বিলীয়মানতা।
কোথাও একটি গাছ
তা'র বহুবর্ষের জীর্ণ দেহ নিয়ে
তা'র অসংখ্য পত্র-পল্লব নিয়ে ফুটে উঠেছে।

কোথাও উড়ে চলেছে বাজপাখী
তা'র পাখায় অসংখ্য রেখার ইন্দ্রজাল
অতি স্পষ্ট তা'র গতি, তা'র প্রখরতা।
অনেক দূরে একটি তালগাছ
তা'র দীর্ঘ আঙুলগুলোর সঙ্গে
মিশেছে যেখানে আকাশ
সেখানে নীল আর সবুজের অন্তরঙ্গতা।

এমনি অসংখ্য রেখা
সরল, বক্র, সমান্তরাল।
কে যেন ছেলেমানুষি আরম্ভ করেছিল,
শেষ পর্য্যন্ত তা'র অগুণতি রেখার
মাঝখান থেকে বেরিয়ে এল এই বিশ্বপট
তা'র অতিস্পষ্ট, সঙ্গতরেখ রূপ নিয়ে
আর নিয়ে সুদূরের বিলীয়মানতা।

শিল্পীর চোখে দেখতে শিখছি;
যখন তা' দেখিনি
তখন?
তখন ছিল জড় বস্তুপুঞ্জ,
ছিল উদাসীনতা।

তিনটি কবিতা

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যা

সমুদ্যত চক্রপাণি দিবসের হল অবসান।
জোয়ার লেগেছে দূরে কূলপ্লাবী আকাশ-গঙ্গার।
সোনার তরণী ডোবে ; শুনি বসে গ্রহদের গান।
আসন্ন মৃত্যুর মুখে একবার দেখা দেবে। আর
স্তব্ধ হয়ে রয় দূরে অঙ্গারের সম
পশ্চিম আকাশ। ফিনিক্সের পালাগান,
হে সূর্য্য! প্রাণীর প্রাণ সুন্দর নির্মম
তমসার শূন্যচরে ভস্মে অবসান।

ভয়

রক্তাক্ত তপন ভাসে পশ্চিম সাগরে।
ঝাঁকে ঝাঁকে বাতাসেরা এল তীরে চলে।
ম্লান হল বালুতীর ; শূন্য জনপদ ;
প্রেম মোর ভীরু হায় জানাই কি বলে।

পাহাড়

সুপ্রশস্ত উপত্যকা পার হয়ে আরম্ভ পাহাড়।
উন্মথিত মৃত্তিকার তরঙ্গেরা স্তব্ধ নীলিমায়।
বৃহৎ ভাস্কর্যে দৃঢ় কৃষ্ণনীল নারীদেহপ্রায়
শায়িত শরীরে যত সুকঠিন স্তনের বাহার।

পঞ্চাঙ্ক

(শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-কে)

মণীন্দ্র রায়

(১)

কীর্ত্তির আগ্নেয় স্তম্ভ
নিমজ্জিত অতিকায় ক্লান্ত বিস্মরণে।
ইতিহাস নিরুত্তর অন্ধকার খনিজ গহনে ;
জনতার রিক্ত হাহাকারে ;
রুদ্ধশ্বাস দিগন্তের ভীরু প্রতীক্ষায়
উচ্চকিত করে নাই দূরাগত যুগান্তহ্রেষায়,—
ধূলিঝড়চলিষ্ণু প্রহারে।
স্তূপীকৃত হতাশায়
দিন যায়—রাত্রি যায়—যায়
বিনীত মরণে।
মুহ্যমান চরাচর স্বপ্নযাত্রী মূঢ় বিস্মরণে॥

(২)

সহস্র অজস্র যারা পৃথিবীর মাটির সন্তান ;
অরণ্যের সজীবতা, সারল্য গুহার
যাদের বর্ব্বর রক্তে আবর্ত্তিত অগাধ অম্লান :
প্রতিদানে পেল যারা ষড়যন্ত্র ক্রুর অবিচার
স্বার্থান্ধ কৃতঘ্ন স্বজাতির ;
ঘর্ম্মাপ্লুত তাহাদের মুখ
মনে হয় ছায়ামূর্ত্তি শত শত—চক্ষুহীন—নিরীহ—উৎসুক॥

(৩)
এ দুর্যোগে বল কবি, বল শিল্পী দূর শতাব্দীর,
নিপীড়িত হৃদয়ের সর্ব্ব ব্যাকুলতা
ছেয়ে যাবে শুধু কথা!
কথা,—শূন্য—পলাতক—স্থির,
বৃথা প্রলোভন স্ফীত, তারপর জীবনের কঙ্কাল প্রাচীর?
শুধু এই! এই পুরস্কার
অন্নদাতা অন্নহীন দেশে দেশে সর্ব্ব জনতার॥

(৪)
তার চেয়ে চল যাই
শস্যহীন শুষ্ক মাঠে, কুটির-অঙ্গনে কৃষকের;
সঙ্কীর্ণ শ্রমিকপল্লী,—বুভুক্ষিত—অভিযোগ নাই;
সেই সব রুদ্ধ গৃহে উজ্জীবন হোক আমাদের।
অখণ্ড মানবসত্তা মুঞ্জরিত হবে ধীরে
রক্তগত চৈতন্যের তীরে
প্রথম কাব্যের মত একক, মহান।
পৌরুষের তপস্যায় উদ্ভাসিত হবে নব পৃথিবীর মাটির সন্তান:
'জাগো, জাগো হে পুরুষ,
নতশির শুষ্ক ঘন মোহরাত্রি পারে
বালার্কশিখার মত। হানো হানো এই অন্ধকারে
তোমার আগ্নেয় সত্তা; হোক উচ্ছ্বসিত
জল স্থল অন্তরীক্ষ অলৌকিক দৃঢ় জাগরণে,
মুহ্যমান এ সৃষ্টি স্তিমিত।
যাও,
উদাত্ত সম্মুখ লক্ষ্যে পূর্ণ চক্রমণে
অবিশ্রান্ত বেদনা উধাও।
প্রত্যয়ের চক্রচাপে পথ তব হোক নিরঙ্কুশ।
জাগো, জাগো হে পুরুষ, হে আদি পুরুষ!'

(৫)
শুধু সমবেদনার দূর আত্মপ্রসাদের চেয়ে
এই বস্তুকণ্টকিত গিরিবর্ত্মে হোক অভিযান।
সমতাসুন্দর পৃথ্বী কল্পনার রৌদ্রে ওঠে নেয়ে,
সেখানে অনন্ত পরিত্রাণ।
এই জীর্ণ শতাব্দীর অরণ্যের উপেক্ষিত দীর্ণ শিবালয়ে
নূতন সৃষ্টির বীজ দিয়ে যাবে মহাকালেশ্বর।
মানুষের সভ্যতার সে দৃপ্ত বিজয়ে
হে কবি, মিলাও তব স্বর।

*　*　*

দূরে দেখা যায়
নগরের সৌধচূড়া বিপ্লবের কৃষ্ণ মেঘে ছায়।
দিগন্ত কাঁপিছে কার উদ্দাম হ্রেষায়॥

দুপুরবেলার চম্পূ

অমিতাভ ঘোষ

সারা দুপুর বসেছিলুম বকুল গাছের তলায়।

আশে পাশে অনেক গাছ পালা
অনেক ফল ফুল, অনেক লতা পাতা।
বর্ষা তখন শেষ হয়েছে আকাশ তখন স্বচ্ছ
মেঘেরা সব হারিয়ে গেছে নিরুদ্দেশের পথে।

কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি
বলতে-না-পারা বনের মিঠে গন্ধ;
সামনে খানিকটা জল জমে আছে
অনেক দিনের আকাশ-ঝরা জল,
সে জল আজও শুকোয়নি
বেরুবারো পায়নি পথ
ভিজে মাটির আলিঙ্গনে নববধূর মত কাঁপছে।
তার বুকের তলায় থিতিয়ে আছে
অনেক মাটি অনেক কাঁকর
অনেক ছিন্ন মুকুল এবং অনেক জীর্ণ পাতা।
তার সেই বাতাস লেগে শিউরে ওঠা বুকের ওপর
লুটিয়ে পড়েছে দুপুরবেলার সূর্য্য
পতির অনুপস্থিতে গোপন-চারী উপপতির মত
ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে
দুপুরবেলার বিজন অবকাশে।

হঠাৎ কিছু দূরেই দেখি:
একটা বাতাবী গাছ আর বাবলা গাছের ফাঁকে
অপূর্ব্ব অদ্ভুত এক ছবি,
হার মানে তার রঙ ধরাতে মানুষ-শিল্পীর তুলি
কল্পনাও থমকে দাঁড়ায় কিছুক্ষণের শোভায়
মুগ্ধ হয়ে অবাক হয়ে দেখি:
ভোরবেলাকার শিশির কণার মুক্তা দিয়ে গাঁথা
ঊর্ণনাভের সূক্ষ্মজালে সোনার কিরণ লেগে
ছোট্ট গীতি-কাব্য একটি কাঁপছে থরোথরো
ঊর্ণনাভের আটটি বাহুর কোমল আলিঙ্গনে।

দেখতে দেখতে ভুলে যাই আমার জীবন
আমার মরণ, আমার লক্ষ মায়া।
ঊর্ণনাভের সামাজিক নামটা উচ্চারণ করতেও যেন
মনে আঘাত পেলুম।

ভাবলুম ঊর্ণনাভ ভালবাসে
দুপুরবেলার সোনালী সূর্য্যকে,
আর তার অদ্ভুত দুটি চোখে দেখলুম
গহন রাতের অপূর্ব্ব এক মায়া?

ছুটি

বিষ্ণু দে

পাহাড়তলীর গোপনগলির ফার্ন বনে
ছোট ছোট আলো লুকোচুরি খেলে ক্ষণে ক্ষণে
পাহাড় ধ্বসার শঙ্কাবিহীন স্বচ্ছ মনে।

সূর্যমুখীর সন্তাপে কবে ঝরল চেরি
সিরিঙ্গা, তাই পসারিণী হাসি করছে ফেরি
দাবদাহ হতে অনেক দেরি।

ভুর্জের গায়ে রূপালি আলোর উপমা লাগে
ঝাউবীথি তাই নবযুবতীর শিহরে জাগে।
শিলীভূত হিম স্তম্ভিত বুঝি এ সংরাগে।

ডেজি ভায়োলেটে সচ্ছল সুখে বনস্থলী
মন্দাকিনীর নির্ঝরে ধোয় রূপের বলী।
পঙ্গপালেরা সানুপ্রান্তরে, মুখর অলি।

তুষারহ্রদের নীলোৎপলের গন্ধ ভাসে
মুহুর্কম্প দেওদারে, লঘু হরিৎ ঘাসে।
কোথায় কিরাত? বৃথা সঙ্কোচ মিথ্যা ত্রাসে।

ছুটি তো ফুরাবে কালিম্পঙে বা দার্জিলিঙে,
দিনযাত্রায় গলাবে মহান্ হরিৎ হিমে,
হালকা হাওয়ার খরবেগ হবে ক্রমশ ঢিমে।

হিংস্র সহরে ফিরবে হৃদয়ে মধুরস্মৃতি,
ঘোর অভ্যাসে শিখবে জীবনযাত্রানীতি,
মানসবলাকা ফেলে দেবে পাখা—এই তো রীতি।

অতএব এসো, পাইনমুখর ঝর্ণাতীরে
লাইমছায়ায়, থাকুক আপেলগাছটি ঘিরে
তাকিয়ে মরুক কালের দূত সে ধূর্ত চিতি॥

বৃষ্টি আর ঝড়

বুদ্ধদেব বসু

বৃষ্টি আর ঝড়, বৃষ্টি আর ঝড়, রাত্রি আর দিন।
দিন ধূসর, বন্ধ্যা, অন্ধকার। আলো নেই
ছায়াও নেই। শুধু বৃষ্টির কুয়াশা, শুধু মেঘের আবছায়া, আর
ট্রামের গোঙানি, ট্র্যাফিকের ঘর্ঘর।

আকাশে চাপা কান্না, হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস।
দীর্ঘ দীর্ঘ দিন, রাত্রি কত দূর?
ক্লান্ত প্রহর, মুহূর্ত মন্থর; কালের শৃঙ্খল-ঝঙ্কনা
অন্তহীন, ক্লান্তিহীন।

রাত্রি; ঘরে শূন্যতা, বাইরে অন্ধকার,
বৃষ্টি আর ঝড়, বৃষ্টি আর ঝড়।
শূন্য শূন্য হৃদয়, ব্যর্থ ব্যর্থ রাত্রি,
শুধু ক্রুদ্ধ শহরের ঘুমহীন গুমরানি।

হৃদয়ে শূন্যতা, শহরে আর্তস্বর, আকাশে অন্ধকার।
ছায়া, হাওয়া, স্বর, মর্মর; ক্রুদ্ধ রুদ্ধ স্বর, দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস
শহরে, শূন্যঘরে, বৃষ্টি-ঝরা অন্ধকারে, কালের শৃঙ্খল-ঝঙ্কারে
সারা রাত্রি, সারা দিন।

দিন শূন্য, পচা ডোবার মতো চুপচাপ। রাত্রিও বোবা,
কিছু নেই। নেই নেই।
বৃষ্টির ধূসর কাপড়ে, বাতাসের শহরের আর্তস্বরে
সৃষ্টির মুখ ঢাকা। কিছু নেই। আমি একা একা।

৩

কালের বিশাল চাকায় অন্ধ মাছির মতো বন্দী,
বিশ্বের জানলা বন্ধ ; অন্ধকার, রুদ্ধশ্বাস,
পচা ডোবার মতো দিন ; পুরোনো বিস্মৃত কুয়োর তলার মতো
রাত্রি ; আর নিঃশেষ নিঃসঙ্গতা, শেষহীন।

রাস্তায় ভিড় ব্যস্ততা মত্ততা। আপিসে ময়দানে রেস্তোরাঁয়
কাজ খেলা নেশা, হাড়-ভাঙা সপ্তাহশেষে জুয়ো, জিন, দুপুরের ঘুম
সব অস্পষ্ট, আড়ষ্ট, শহর মূর্ছিত। বৃষ্টি,
বৃষ্টি। রাস্তায় ছায়ার ঠেলাঠেলি, দুঃস্বপ্নের হাড়হীন মিছিল।

অকায়, অকঙ্কাল কলকাতা, ছায়াময় ; স্বপ্নের মতো
স্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বহীন। আমিও ছায়া, হাওয়ার ছোঁওয়ায়
কাঁপি দেয়ালে, পরদার আড়ালে ; দোলে আমার বুকের মধ্যে
বৃষ্টি আর ঝড়, বৃষ্টি আর ঝড় রাত্রি আর দিন।

জন্ম

বুদ্ধদেব বসু

তোমাকে বুকে ক'রে, তোমাকে বুকে ভ'রে কাটে আমার রাত্রি।
সমস্ত চিরকাল সেই উত্তাল অন্ধকার-মন্থিত মুহূর্তে
থমকে দাঁড়ায়—যেন পথ হারায় অন্ধ অবায়ু চিরায়ু মহাশূন্যের যাত্রী—
কোন উদ্যত খড়্গের মতো আমার উত্তপ্ত মাংসের মধ্যে খুঁড়ছে।

তোমাকে বুকে রেখে, তোমার বুকের মধ্যে ঢেকে আমার মুখের আহত
বিক্ষত ক্লান্তি
প্রতি নিঃশ্বাসে আমি নিঃশেষে শোষণ করি তোমার রাত্রির শক্তির উৎস ;
হে চোখ-ধাঁধানো চূড়া ! আমার দৃষ্টি যে ফুরায়—এ কী জলন্ত অশান্তি,
এ কী শান্তি !
হে অদৃশ্য, কবোষ্ণ বন্যা, স্পর্শময় প্রাণ-ঝরনা, কোন সঙ্গোপন সুরঙ্গ
থেকে তুমি উঠছো !

আগ্নেয় দুঃসহ, তীব্র, উত্তাল, বিশাল এই রাত্রি।
কাঁপে পাহাড়, ভাঙে কঙ্কাল-হাড়, জাগে সুরঙ্গে জোয়ার, অদম্য।
হে দৃষ্টি-অন্ধ-করা যুগ্মচূড়া, এ কোন যজ্ঞ ? বলো,-তুমিই কি ধাত্রী
দিগন্তে ঘুমন্ত সূর্যের ? হে অন্ধকার, তুমি কি মৃত্যুর, তুমি কি জন্মের
সিংহদ্বার ?

এ কী অসহ্য মৃত্যু ! এ কী উজ্জ্বল, অলজ্জ নব-জন্ম !

গানের পাখী

নিশিকান্ত

কবি এবং সুর-শিল্পী বন্ধু দিলীপকুমারকে তার জন্মদিনে প্রীতিপূর্ণ উপহার

ঝরে পারিজাত-পরাগ তোমার সুরে,
ভাসে মন্দার-গন্ধ তোমার গানে।
সুদূর তমকে রাখোনি তো তুমি দূরে,
আপন প্রাণের প্রকাশে যে তারে এনেছো-ধরার প্রাণে।
নীল-নিলয়ের ঊর্ধ্ব-অমল-অসীম-আসব-ধারা
পান কোরে তুমি হ'লে কি আপন-হারা!
এই পৃথিবীর পথে তব গতি পলকে-পলকে আনে
কোন অলকার আলোক-রথীর রথে-চলা-অভিযানে!

হে গানের পাখী! মরতায় বাসা বেঁধে
একি রাগিণীর অমর মাধুরী ঢালো!
কার সাধনার সঙ্গে সাধনা সেধে
আঁধার-ধরণী 'পরে মর্মের সঙ্গীত-শিখা জালো?
জন্ম তোমার ধরেছিল কোন্ মর্ত্য-কালের দিন!
এখন তোমার সাঁথে সে যে কাল-হীন—
—লীলার কুসুমে সাজায়ে অবনী অমর্ত্য-অবদানে
কার কণ্ঠের মালাখানি গাঁথে তোমারি কণ্ঠ-তানে।

দুটি চীনে কবিতা

অজিত দত্ত

(১)

পথিক শুধায় মোরে কেন আমি একা ব'সে থাকি এই সবুজ পাহাড়ে।
আমি শুনে হাসি শুধু, চিত্তে মোর পরিপূর্ণ আলস্য নিবিড়।
রক্তিম ডালিম ফুল ঝরিয়া ছড়ায়ে পড়ে জলের কিনারে—
এই যে আকাশ আর পাহাড় দেখিছ—এরা নয় তোমাদের পৃথিবীর।

(২)

বৌদ্ধ সঙ-সি পুড়িয়া মরিল চিত্তশুদ্ধি তরে
কিউ-হো পাহাড়ে, ভালো-ভালো কাঠ আনি',
ঙান-সিও ভালো, মরিল না বটে, অনেক কষ্ট ক'রে
জালিল চিত্তে জ্ঞানের প্রদীপখানি।
নমস্য এরা, বুঝেছিলো ঠিক, মনের কলুষ যত
দূর করাটাই সব চেয়ে বড়ো ব্রত।
কিন্তু, বন্ধু, ঠিক সেই ফল অনায়াসে যদি চাও,
অতি অভিজ্ঞ উপদেশ মোর নাও;
একটি বোতল পুরো মদ খেয়ে তেষ্টাই যদি বাড়ে
বোতলে বোঝাই মদের ভাঁড়ারে যাও।

মুক্তি

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

হৃদয়-সমুদ্রতীরে ধূসর মুহূর্ত্তগুলি ক্ষয়ে যায় ধীরে…
পদচিহ্ন এঁকে' চলো উপলসঙ্কুল বালুতটে :
হারানো স্বপ্নের দল—অপ্রমেয় ; নাহি ফিরে
আসন্ন সঙ্কটে ।

মৈত্রীর মৃত্যুকে
দেখেছি জীবনে, সে ত' প্রভাতী-কুয়াশা ।
আলোর উদ্ধত পাখা স্বপ্নাতীত আকাশের বুকে ।
জীবনের পদক্ষেপে শাণিত ইসারা হানে অভিশপ্ত, ক্ষুধিত দুর্বাসা ।
রাঙা গোধূলির মোহ রক্তাক্ত চেতনা হোতে নির্বাসিত করে
উচ্ছ্বসিত অন্ধতায় তন্দ্রালস পৃথিবীর ভুল ।
বন্দীর বন্দনা—জানি, ভীরু রাজকুমারীর চোখের পল্লবে
নিঃশেষে নির্মূল !

কুমারীর কামনাকে কণিকায় ভেঙেছে ভীরুতা,
ভঙ্গুর ভঙ্গীকে মিছে টানো ;
কালো আকাশের চোখে অশরীরী জটিল বন্ধুতা
ধ্রুবলোকে ক্ষয়ে গেছে জানো ?
অধীর ইস্পাতে গাঢ় রক্তের মিতালি বুঝি জলে
গুহার গহন কুয়াশায়,—
নীড়হারা দিনগুলি সূর্যের উদ্দেশে উড়ে' চলে;
হৃদয়-সমুদ্রতীরে ধূসর মুহূর্ত ক্ষয়ে যায় ।

সোনার সিঁড়ি

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আজকের এই রাত শান্ত সুরভিত
কীট্‌সের বাঞ্ছিত মৃত্যুর মতো ।
কিন্তু মাঝে মাঝে আঙুরের মত জড়িয়ে যাওয়া
অন্ধকারের ফুল্‌কি আগুন-লতা
ছেয়ে আসে সারা অঙ্গে ।

দেহ পুড়ে যায়—
ভস্মাবসানে পড়ে থাকে
নির্বাণ-আহুতির ক্ষীণ বহ্নিজ্বালা,
মানসিক অপরাগ ।

ঐশী অতৃপ্তি ? কাব্যে বলে তাই ।
জীবনেও কি তা সত্যি নয় ?
যদি সিদ্ধ হয়ে যেতো সর্ব্বথা উপলব্ধি
থাকতো না অনির্ব্বচনীয়তার আকুতি ।
যদি ফুরিয়ে যেতে তুমি
কি নিয়ে নিয়ত গড়ে উঠ্‌ত
আমার অতৃপ্ত স্বর্গকামনা ?

সোনার সিঁড়ির শেষ নেই।
মাটি থেকে লতিয়ে উঠে
দিগ্‌বলয় ভেদ করে
ধূমায়িত নীল নীহারিকার পুঞ্জে পৌঁছয়।

সকলেরি লালায়িত চোখ সেই দিকে।
বৈশ্য-রাবণের লোলুপতা
মধ্যবিত্ত পুরুবার স্বপ্নবিলাস
বিদ্রোহী স্বাষ্ট্রের সাম্যলিপ্সা
আর আমার পরিতৃপ্ত ঊর্দ্ধরতি
তোমায় ঘিরে।

স্বপ্ন ভাঙা

বিষ্ণু ভট্টাচার্য

নিমন্ত্রণে লুব্ধ মন ;—মোরে দিয়ে স্বপ্ন রচিবে কি ?
নন্দনের সুখ-স্বপ্ন রাত্রি অবসানে ?
অতল বারিধি-গর্ভে আবিষ্কৃত নব পুষ্পোদ্যান,—
স্বপ্ন তার অলৌকিক—
পাতাল-দুহিতা যত স্বপ্ন-পসারিণী।
বিজ্ঞানের ঠুলি-পড়া চোখে
বাস্তবতা করিছে সন্ধান
অগণিত জনগণ—মুষ্টিমেয় ধীর বীর্যবান ;—
এও স্বপ্ন হায়! আমার বেসাতি হবে এই স্বপ্ন নিয়ে!
ছায়াচ্ছন্ন বনবীথিকায়
যেথা শুয়ে তরুণ-তরুণী
আবেশ-বিহ্বল, বসন্তের মদিরা-আকুল
কোকিলদম্পতী যেথা অশ্রান্ত উদাস কণ্ঠে
আলাপনে রত, সেথা আমি স্বপ্ন রচিব কি ?
শরতের নীলাকাশ অসীম রহস্য দিয়ে ঘেরা,—
জ্যোতির্ময়, মেঘমুক্ত,—যেন নীল রবিকরগাঁথা
দিগন্ত-বিতত স্বচ্ছ পটভূমিকায়।—
কর্মব্যস্ত দ্বিপ্রহরে কতদিন ডেকেছে আমারে
নীরব ইঙ্গিতে, আর মায়াময় বাক্যহীনতায়।
ডাকিল, দিলেম সাড়া ; রাজপথে নামিনু সাহসে,
ভোরের অস্ফুট আলো জানালো আভাষে
দীপ্তকর দেবতার রূঢ় আবির্ভাব।

বসন্তের বন্যা থেকে থেকে
দিয়ে যায় আলোড়ন
পঞ্চভূতে গড়া এই কূটস্থ অন্তরপুরুষেরে।
এই স্বপ্ন মোর? খুলিল সহসা আবরণ:
রস-রিক্ত রুক্ষ মরুভূমি—
অশেষ বালুকা-কণা—
অসহ আলোর অন্ধকার।
কোথায় বনানী,
কোথায় শ্যামল সমতল?
রক্ত আঁখি প্রশ্ন করি এ কী মায়ামরীচিকা,
একাকী পান্থেরে এ কী নিষ্ঠুর ছলনা।
অনুচ্চ কণ্ঠের স্বর, প্রাণ-শক্তি ক্ষীণ,
আমি তব মালঞ্চের মালাকর কখনো হবো না।

মনোবিকলন

সমীর ঘোষ

দিগন্তে দ্বিখণ্ড সূর্য্য
খনিতে গলিত অন্ধকার:
বিস্ফোরকে জয়তূর্য্য
বাজিছে ধাতব সভ্যতার!
জীবনের জয় শেষ
যৌবনের তরল উত্তাপ
কৌণিক বৃক্ষের দেশ
খুঁজিতেছে করিতে বিলাপ!
মাত্রাহীন দিন সব
মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে গেছে।
শীর্ণ রাত্রির উৎসব
পৃথিবীর পরিপ্রান্তে নাচে।
সৃষ্টিহীন অলসতা
সাহিত্যিক করিতেছে শেষ
লুপ্ত উষ্ণ উর্ব্বরতা
আনন্দের কুঞ্চন বিশেষ!

পলায়ন

সরোজরঞ্জন আচার্য

বুদ্ধের নয়নে নিদ্রা নাই।
মুক্তি চাই
জীবজন্ম হ'তে চির নির্ব্বাণের পথে।
লোকাতীত কল্পনার রথে
মুমুক্ষু চিত্তের নিত্য গতি;
মোক্ষ? সে যে আত্ম-রতি
সমষ্টির সঙ্কট এড়ায়ে
স্বপ্ন রচা আপনারে নিয়ে।

বাংলার মেয়ে

আবুল হোসেন

(কবি সুফিয়া এন. হোসেন ও রাধারাণী দেবী-কে)

১

সব প্রথমেই দিয়ে রাখি পরিচয়।
তার মানে এই নয়: এটাই সুবিধা, এতে সংশয় নেই
বরং ব্যাপার উল্টো একেবারেই অর্থাৎ কিনা নামটা না দিলেই ছিল ভালো।
কারণটা নয় মোটেই ঘোরালো।
বাঙালীর মেয়ে দোয়াত কলম আর কালি হাতে পেয়ে প্রকাশ্যে কোন পত্রিকাতে
আপন জবানবন্দী ছাপাতে সুরু করে দেবে,
এতখানি নীচে নেমে আসবে এ দেশী মেয়ে!
যাদের ন্যায্য বৈঠক হ'ল বদ্ধ হেরেম, যাদের প্রেম খাঁটি আর তাজা থাকে শুধু
অন্দরে, বাইরে এলেই যারা পথ-আবর্ত্তে পড়ে হয় দিশাহারা নয় একেবারে কানা,
তাদেরই একজনা হাজার হাজার নারী পুরুষের সম্মুখে মুখ তুলে আপন আত্মকাহিনী
বলবে খুলে?
ছি...ছি...ছি!
এমনি হাজার কথা উঠবেই উঠবে জানি সে বেশ; তাইত নামটা সবার শেষ বলাই
সুবিধা হ'তো।

২

পুরুষের দল সত্যি ভাগ্যবান ; স্বীকার করতে বাড়ছে না জানি একটুও মান।
তবু কথাটি খাঁটি।
আমাদের সাথে ভাগ্যের রেশারেশি খুব যেন বেশী ;
প্রমাণ। আমরা যদি বলি : রূপে শ্রেষ্ঠ মেয়েরা ;
ওরাও বলবে : সিংহী নয় গো, সুন্দর সিংহেরা, ময়ূরীর চেয়ে ময়ূর
দেখতে ভালো ;
মেয়েদের রূপ ক্ষীণায়ু আর পুরুষের রূপ ধারালো সারালো।
যদি বলি : শোন, ধৈর্য্যে আমরা সেরা ;
ওরাও বলবে : বাইবেল কভু পড়েনি মেয়েরা, ছিল ধৈর্য্যের আদর্শ
বীর যে সে নয় নারী।
যদি বলি : প্রেমে শ্রেষ্ঠতা দাবী আমরা করতে পারি ;
ওরাও বলবে : মর্ত্ত্যে সেরা যা প্রেমের কবিতা পুরুষের দল লিখেছে
সবই তা।
মেয়েদের কথা মেয়েরা লিখেছে অল্প তবু খুব কম কাব্য অথবা গল্প
তাদের না নিয়ে
হ'য়েছে মর্ত্ত্যে ; সাহিত্যে নাকি ওরাই রয়েছে ভ'রে।
কেউই কিন্তু তাদের কাহিনী লেখেনি সত্যি ক'রে।

৩

আমরা যারা এ দেশী মেয়ে, যাদের মূল্য ঘরের নূতন পিয়ানোর চেয়ে
কানাকড়ি নয় বেশী
তাদের সাথেও আছে মনে মনে কবিদের রেশারেশি।

তাইত আজকে কলম নিয়েছি আমরা নিজের হাতে ; রঙ দিতে
চাই আমাদের
কাহিনীটাতে।—
তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল কতবার, হয় না ঠিকানা তার ; তবু কোনদিন
মুখ খুলে
প্রকাশ্যে কথাটা বলার সাহস পাইনি মনে, কারণ গোপনে থাকাই
এ দেশী মেয়েদের
প্রথা।
এর অন্যথা হ'লেই সর্ব্বনাশ ; অগ্ন্যুৎপাতে সংসার-রূপ পাহাড়ের
ধ্বসে পড়বেই এক পাশ।

'চলে নীল সাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরান সহিত মোর'
হে কবি-কিশোর, তোমার বীণার ছন্দে যেদিন গেয়েছিলে এই গান,
তোমার অর্ঘ্যদান,
নিলাম মাথায় তুলে।
তারপর সেই বিজয়ের হার খুলে সরম জড়িত মনে পরিয়ে দিলাম
তোমার কণ্ঠে
নিভৃতে গোপনে।
তুমি কি পাওনি টের আমার কঠিন বোরখা-ভাঙানো পাগল প্রেমের ?
তোমরা তো সব সাপুড়ের দল।
তোমরা করেছ আমাদের চঞ্চল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, তোমরা তুলেছ
কলকল্লোল পর্দ্দার
আবরণে, যুগে ও যুগান্তরে তোমরা আসি অন্দর অভ্যন্তরে বারবার ক'রে
বাজালে বাঁশী, জাদুর মন্ত্র দিলে পথে ঢেলে ; তারপর অবহেলে
গেছ প্রতিবার।

ক'জনার দেখার হ'য়েছে বল অবসর কার মনে তার বিঁধেছে
বাঁশীর শর ? তোমরা
পেয়েছ টের কখনো কি কেউ আমাদের প্রাণে তোমরা তুলেছ কি ভীষণ ঢেউ ?

৪

ছোটবেলা থেকে শুনেই আসছি ঠাকুর মায়ের ঝুলি, আরব্য
উপন্যাসের গল্পগুলি :
রাজপুত্রেরা পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে কত নদনদী পর্ব্বত বন-মরুভূমি পথ ধরে
রাজকুমারীর তল্লাসে ছুটেছে উর্দ্ধশ্বাসে ; রাজপুত্রের ওড়না পড়েছে
খুলে, বাতাসের
ঘায়ে কাঁপন উঠেছে উস্‌কোখুস্‌কো চুলে, পক্ষীরাজের লেজ খাড়া হ'য়ে
উঠেছে ওপরে,
লাগামের কোনা সাদা হ'ল ফেনা প'ড়ে।
রাজকুমারের চোখে যেন ঘুম নেই ; চলেছে তো চলেছেই !
রাজকুমারীর খোঁজ কোনোদিন ওরা পাবে কিনা সে কথা গল্পে
লেখে না, আমিও
তাইত জানিনা ; রাজকুমারীরা ওঁদের পথের দিকে চেয়ে থাকে
জানলার ফাঁকে
এমন কথাও শুনিনি উপন্যাসে তবু যে কথাটি বারবার মনে আসে
লজ্জার মাথা
খেয়ে সোজা ফেলি বলে :
আমার মনের গহন অতলে আছে যে রাজার কুমারী, হে রাজকুমার, সে তার
মনের দূরবীন পেতে তোমারই অগ্রগতির করেছে কামনা।

হয়ত জান না তুমি যে রাস্তা'ধ'রে গেলে চ'লে তারই পার্শ্বে কোন
প্রাসাদের বাতায়ন-
তলে রাজকুমারী লুকায়ে ছিল যে প্রতীক্ষায়।
পথ দিয়ে তুমি দ্রুত ছুটে যেতে সে তোমার চারু পায় তার কণ্ঠের
মণিহার খুলে ফেলে
দিয়েছিল পথে ; তারপর বেদনায় লুটিয়ে পড়ল সে কুমারীশয্যায়।
হে'রাজকুমার, তুমি নিশ্চয় শোনো নি তার সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা,
তোমার যাত্রাপথে
তাই পড়েনিক কোনো বাধা।

৫

কালিদাস ছিল যে সময়ে বেঁচে তার সে যুগের মেয়েরা, মদনিকা
আর মালবিকা
অনসূয়া আর প্রিয়ংবদারা ঝুলিয়ে দু'কানে মল্লিকার দুল, আলগা
খোঁপায় গুঁজে
শিরীষের ফুল, গলায় দুলিয়ে অপরাজিতার মালা, চরণে নূপুর, কটিতটে
বেঁধে পুষ্প-মেখলা সন্ধ্যায় গিয়ে বসত কুঞ্জে একান্তে নিরালায়।
রাজকুমার যদি এই পথে যায় তাহ'লে সে তার গলা থেকে হার খুলে
পরিয়ে দেবেই ওর পদমূলে।
সে যুগের মেয়ে শিক্ষায় বল দীক্ষায় বল নিকৃষ্ট ছিল এ যুগের চেয়ে, বৈজ্ঞানিক
শাস্তরসম্মত অনেক কিছুই জানত না আর বুঝত না এত সব
উন্নত কারচুপি।

তবু চুপি চুপি ওরাও থাকত রাজকুমারের পথ চেয়ে, স্বপ্ন আসত ওদের
নয়ন ছেয়ে।
রাজকুমারের অশ্বের ক্ষুরধ্বনি বেড়া-দেওয়া আশ্রম-আবরণ তলেও
উঠত সঙ্গীতে
রনরনি'।

৬

আজকের দিনে রান্নাঘরের অন্ধকারার মাঝে যে মেয়েরা বসে
চীনের বাসন মাজে,
মসলা পিষতে চোখ ভরে আসে জলে তাদেরো অন্ধ জীবনের তলে
উঁকিঝুঁকি মারে
রাজকুমার।
পেঁয়াজ কাটার ফাঁকে মনের গহনে রবি ঠাকুরের একটি লাইন
হয়ত চিত্র আঁকে,
হয়ত কখনো মনে তোলে দোলা শেলির একটি কবিতা, আত্মভোলা
কীট্‌সের অমর
ওড্‌গুলো, হয়ত পথের ধূলো সংবাদ আনে রাজকুমারের আগমনের : সুপ্ত
মনের আড়াল-দেওয়া পর্দাটা যায় ফেঁসে একটি নিমেষে।
বোরখার বেড়া ভেঙে ছুটে আসে মালবিকা মদনিকা। রাজকুমারীর
টীকা কপালে
তার ; সেও খোঁজে তার রাজকুমার।

৭

পুরুষেরা খুব ভাগ্যবান সে মানি। রাজকুমারের জবানীতে তারা
লিখেছে রাঙায়ে
নিজেদের কাহিনীখানি, তাদের কৃচ্ছ্র সাধনার কথা পেল অমরতা।
এ দেশে নেইত মেয়েদের কবি ওকালতি পাশ-করা, জানে না কলম
ধরতে, কারণ
সামান্য লেখাপড়া।
ওদের কাহিনী যা কিছু রয়েছে কবিতায় রচনাতে, বেরিয়েছে তার
সবই পুরুষের হাতে।
তাইত ওদের রাজকুমারীরা পালঙ্কে শুধু ঘুমিয়ে কাটায়,
ওরা সব মৃত একান্ত অসহায়।
মেয়েদের নেই কবি।
রাজকুমারীর কাহিনী তাইত জানল না কেউ, দেখল না তার
গোপন মনের ছবি।

শর্ব্বরী

(To Night)

প্রমথনাথ বিশী

দ্রুতপদে উত্তরিয়া পশ্চিম সাগর
স্বাগত শর্ব্বরী !
রহস্য-সুদূর কোন্ গুহার ভিতর
একেলা নির্জ্জনে বসি দীর্ঘ দিবা ধরি
কত স্বপ্ন নৈরাশ্যের গাঁথিয়া স্বপন
আপনারে কর তুমি মধুর—ভীষণ !
এস ত্বরা করি ।

জড়াও ও তনুখানি ধূসর বসনে
নক্ষত্র-খচিত !
আঁধারিয়া কেশপাশে দিনের নয়নে
চুম্বনে চুম্বনে তারে করিয়া পীড়িত,
নগর সাগর গ্রাম কর গো ভ্রমণ,
দেশে দেশে বুলাইয়া মদির স্বপন !
হে চির বাঞ্ছিত !

প্রভাতে জাগিনু যবে, তোমারে খুঁজিয়া
ফেলিনু নিঃশ্বাস !
তপন উঠিল উচ্চে শিশির শুষিয়া,
মধ্যাহ্নে পড়িল নুয়ে পত্র, পুষ্প, ঘাস ;
চলে ক্লান্ত দিবা, গাহে বিশ্রামের গীতি
যেতে যেতে ফিরে চায়—অপ্রিয় অতিথি !
ফেলিনু নিঃশ্বাস !

তোমার সোদর মৃত্যু, কহিল—লহ না
লহ না আমারে ;
তোমার দুহিতা সুপ্তি, স্বপন-লোচনা
মধ্যাহ্নে ভ্রমর গুঞ্জে কহে বারে বারে,
তোমার নিকুঞ্জ তলে বাঁধিব কুলায়,
লবে কি আমারে ? কহিলাম তায়
চাহি না তোমারে ।

আসিবে আসিবে মৃত্যু তব অবসানে
বড় ত্বরা হায়—
সুপ্তিও আসিবে ত্বরা তোমার প্রয়াণে
তাদের কারেও মোর মন নাহি চায় ;
তোমারে তোমারে চাহি শর্ব্বরী আমার
দ্রুত হোক প্রত্যাসন্ন তব অভিসার—
আয় ত্বরা আয় ।

শেলি

বিলাপ

প্রমথনাথ বিশী

('*O World, O Life, O Time*')

হা জগৎ! হায় কাল! হায় রে জীবন!
তোমাদের শেষ ধাপে করি আরোহণ
পিছনে ফিরিয়া চেয়ে কাঁপি যে সভয়;
আর কি ফিরিবে কভু হারানো যৌবন?
নহে, নহে, আর কভু নয়।

দিবস রাত্রির বন্ধ কেমনে স্খলিয়া
কি এক আনন্দ যেন গিয়াছে চলিয়া;
বসন্ত, বরষা, আর শীত ধূম্রময়
বেদনা জাগায় প্রাণে,—সুখ স্বাদ দিয়া,
নহে, নহে, আর কভু নয়।

শেলি

মোড়

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু-কে)

আমাকে ঘোরাও কেনো? এ অশনি গর্ব্বে
সময়ের স্ফীত নদী কম্পিত সরল।
অনলস কাল বোনে উর্ণা-স্মৃতি অকৃপণ মোহে
আমাকে ঘোরাও কেনো, বেপথু হতাশ।

জানু ছিঁড়ে জাহ্নবীর পুনর্জ্জন্ম দুরপরাহত
কতবার ভুল হল, জীর্ণ প্রেম—শশকবিষাণ।
আত্মগর্ব্বে অতিস্ফীত চিরদিন অদিতির মত
জীবনের নীলা-স্বপ্ন গুপ্ত হল ক্লান্তির গহবরে।

সূর্য্যরশ্মি ঘেরা যত ক্ষীণকটি নারীবাহিনীর
সরল মসৃণ মিথ্যা, অজেয় তবুও।
ভীত গর্ব্ব, কামনার ঘন অবসাদে
করুণ পল্লব নীচে আজিকেও জাগাবে বিভ্রম।

স্বচ্ছ মেদে সরলতা, অভিনব অভিনেতা যেন
উত্তেজিত জয়গর্ব্বে, সময়ের শাসনে উদ্ধত।
শৈবালে পিচ্ছিল শত উপলের পাহাড়ের মত
প্রতিদিন ক্লান্তিহীন পৃথিবীর আত্মপরিক্রমা।

আমাকে ঘোরাও কেনো শশকবিষাণে
অনলস অন্ধগতি হতাশার গহ্বরের টানে
আমাকে ঘোরাও কেনো জয়হীন জীবনের পথে
নীলাস্বপ্ন মিলাবার সময় এখনি।

প্রলয়

নিমেষ রায়

মিলেছে সন্ধান
নিজ কূট নিয়মের জাল
নিয়তির হয়েছে বন্ধন।
এনেছিল দুঃখ সুখ
মরে গেছে ক্ষীণজীবী সুখ।
দুঃখ বেঁচে ছিল
তিলে তিলে জমেছিল বেদনার কণা।
তাই আজ
মিলিয়াছে কালের সীমানা।
যত দীর্ঘশ্বাস
এতদিন মরুবালু ছিল আঁকড়িয়া
উপেক্ষিয়া সযতনে অশ্রুমেঘমায়া
তারা আজ শ্বসিতেছে ফিরি,
উদাসীনা শূন্যাসীনা
মৌনতার বক্ষ চিরি চিরি,
তারা আজ তোলে রণরোল
মহাকাল বক্ষে তাই প্রণয়ের দোল।

ঊর্দ্ধে ঘন নীল নভতল
নিম্নে জল
তলহীন, তটহীন বিক্ষুব্ধ চঞ্চল,
মেলি উর্মিফণা
উগারে মরণক্ষিপ্ত গরলের ফেনা।
মধ্যে বসি কৃষ্ণা তমস্বিনী
ধ্যানমগ্না শব-তপস্বিনী
কণ্ঠে জলে দাহদীপ্ত বিদ্যুতের শিখা
বিদ্রোহীর বরণ-মালিকা।
মিলিয়াছে শেষ
সৃষ্টির শৃঙ্খলে বাজে ভাঙনের রেশ।

সূর্য্যাস্তে

প্রজেশকুমার রায়

পড়ন্ত রোদ তোমারে পরালো
কিরীট ইন্দ্রানীর,
উজ্জ্বল দিক্‌চক্রের মতো
কর্ণাভরণ জ্বলে—
ক্ষণস্বর্গের চূর্ণ সোনায়
সারাটি কক্ষ ঝলে।

ঝরে দুর্লভ মুহূর্ত্তগুলি
অলক্ষ্যে স্বর্গের—
তোমারে জড়ালো এ কী মায়াজাল
দিনান্ত সূর্যের!

আজ বসন্তে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

আবার উতলা বায়ু গতপত্র কৃষ্ণচূড়া শাখে।
স্বেদাক্ত মুখের 'পরে মশালের আলোক কঠিন।
দিগন্তে দোর্দণ্ড সূর্য্য প্রত্যহের রক্তটিকা আঁকে।
ঋতুচক্রে ঘোরে ফেরে ভ্রষ্টলগ্ন যাযাবর দিন।

ওষ্ঠাধর বাক্যহীন চোখে চোখ মিলেছে যেবার
চাহনি ফিরিয়ে নিয়ে লক্ষ্য করো নীল নভোতল।
জন্ম, মৃত্যু, প্রজননে অজানিতে যৌবন বিকল।
বর্ষার নদীর মতো কালস্রোত আজো ক্ষুরধার।

খনিতে-খনিতে জাগে ইস্পাতের গাঢ় অন্ধকার।
অঙ্গময় ধুলো মেখে রক্তমুখে শ্রমজীবী ঘোরে।
প্রবল হৃদয়-তাপ কী শঙ্কায় ওঠে বেড়ে জোরে।
প্রখর শীতের শেষে লবণাক্ত রজনী আবার।

বিপুলা পৃথিবী আর শূন্যে শূন্যে নিরবধি কাল।
আকাশে গম্ভীরভাবে লাল মেঘ ঘোরাফেরা করে।
কাস্তে হাতে কৃষকেরা শস্যহীন মাঠে ঘুরে মরে।
বসন্ত বাতাসে ছাখো বিজড়িত সুকঠিন জাল।

হসন্তিকা

সমর সেন

(১)

নৈরাজ্য আর লাল ধ্বংস শুধু।
ভোঁতা বর্শায় কাজ নেই আর,
সম্বল—মৌনব্রত, ঈশ্বর, বেণের আশ্রয়।
নেপথ্যে অহরহ আশ্বাসবাণী :
গণতন্ত্র আসন্ন,
সামনে দণ্ড হাতে তারি শিষ্ট দূত,
কয়েক দিনের শান্ত তদারক গরাদের আড়ালে।

কানাকানি ; মরণকামড়ের মন্ত্রণা
ঘনশ্যাম সন্ধ্যায়।

(২)

গুমোট রাত্রি ধীরে ধীরে ঘনায়,
বারুদগন্ধী দেহ,
বিস্ফোরক আলিঙ্গনে লুপ্ত করে স্থান, কাল।
এ অশুভলগ্ন সংঘাতের কী ফলাফল,
কোন্ অসুরের প্রসব,
কী অজানিত সর্বনাশ ?

নক্ষত্রের অমর আগুনে
অন্তরীক্ষে উৎকণ্ঠায়
দৈব দর্শকেরা নিঃস্পন্দ জাগে।
পৃথিবীর ছায়া পড়ে, চকিতে নীল চোখ কাঁপে,
সামনে দেখে :

স্বেচ্ছাচারী যম একমাত্র অধিপতি ;
মহাশূন্যে কতো সূর্য শেষ, নিরন্তর আয়ুক্ষয়,
নিরন্ন মহাকাল ; শুধু দিনগত পাপক্ষয়।
স্থবির পাহাড়ে এক সূর্যের তির্যক রেখায়
মাঝে মাঝে দুর্যোগ ঘনায়,
পবনদেবতা দিকে দিকে রক্তগন্ধবহ।
পুঞ্জীভূত শতাব্দীর প্রতিশোধ,
এ কঠিন কঙ্কালদেহে একবার প্রাণ দাও,
হে কাল, হে মহাকাল!

(৩)

নানাভাবে কসরৎ দেখায়, মোটারে মজা লোটে ;
এদিকে স্থান নেই স্থান নেই রব,
ছোট এ ফ্যাক্টরী।
ধানক্ষেত জীর্ণপ্রায়,
অগণন ধোঁয়ার ফণা, চিমনিতে চিরেছে আকাশ।
তারি আশেপাশে ট্রাম বাস বিমর্ষ মানুষের ভিড়ে
কারা যেন পথে পথে নিঃশব্দ ঘোরে!
অবশ্য কন্দর্পকান্তি নয়,
তবু সাবলীল আত্মীয়তায় শূন্য হৃদয় ভরে,
দু হাতে সাফ্ করে যতো জটিল জঞ্জাল।

(৪)

কানে বাজে শুধু বাজে আনন্দভৈরবী।

নিরুদ্দেশ কতো বেকার,
বহুদিন বেকার, তবু মুখে তোমার গান :
তোমার সবুজ ধান, অবিরাম জল,
অসংখ্য বর্বর পাহাড়!
আমার দেশে দুধারে স্তব্ধ ধূসর মাঠ,
মধ্যে উদ্দাম নদী,
ঝড়, বৃষ্টি ; বিদ্যুৎ চেরে আকাশ ;
অন্তরীক্ষের আগুন ধীরে ধীরে শেষ হবে,
নীলপদ্ম হবে নিঃসঙ্গ আকাশ।

মাঝরাতে : ট্রেনে

বিভূতি চৌধুরী

মাটির ধূলোর মতো গুঁড়ো বুঝি হয়ে যায় রাত্রির পাথর,
ট্রেনের দুরন্ত গতি পৃথিবীর বুকে আনে দক্ষিণের ঝড়।
দেহের শিরায় নেশা লাগে—
আকাশের দূর প্রান্তে তারারা দুঃস্বপ্নে বুঝি জাগে।
সঙ্কেতের নীল বাতি—লাল বাতি—কেউ ডাকে, কেউ করে মানা,
মনে হয় লাল পরী নীল পরী উড়ে যায় আকাশেতে মেলি' তার ডানা।
মাঝরাতে ট্রেন চলে উল্কার মতন,
আফিমের বৃষ্টি ঝরে—ঝিঁঝিঁ-রাও মরে গেছে—রাত অচেতন।

তীব্র—তীব্রতর গতি—শব্দের ঢেউয়েরা কেঁপে যায়,
ঘুমের শিশুরা নাচে দু' পাশের গাছের শিরায়।
আরো তীব্রতর গতি—ছুটে চলে ধেয়ে চলে
সে গতির কোটি ইলেকট্রন,
নেবুলা ও নীহারিকা ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠে—
ট্রেন চলে উল্কার মতন।
রুদ্ধ হ'য়ে আসিছে নিঃশ্বাস,
আঁধার সাগর-তলে টর্‌পেডো চলে বুঝি
দুই হাতে সরায়ে বাতাস।
সন্ধানী আলোক জ্বলে—রেখা তা'র আকাশেতে মেশে—
মাঝরাতে সূর্য ওঠে, মনে হয় চলিয়াছি ফিন্‌ল্যাণ্ড দেশে।

ট্রেন চলে কালো রাতে—অদ্ভুত বিস্ময়,
আঁধারের গুহা হ'তে ঘুমন্ত পৃথিবী কথা কয়।
মাটি ও আকাশ আর নক্ষত্র ও নীহারিকা উন্মাদ চঞ্চল,
মাটির বুকেতে নয়—দেহের শিরার মাঝে ট্রেন চলে—রক্তে কোলাহল।
লক্ষ কোটি জীবনের বীজাঙ্কুরা খেলা করে মাথার ভিতরে,
ট্রেন চলে মাঝরাতে—মনের প্রত্যন্ত ভাগে
গতি ও শব্দের বৃষ্টি ঝরে।
নিঃশব্দের অন্ধকারে ট্রেন যায়—
পৃথিবী ও রাত শুধু স্বপ্নে শিহরায়।

ন তু ন ক বি তা

অলকানন্দা, নিশিকান্ত। কালচার পাবলিশার্স, দুই টাকা।

এক মুঠো, অমিয় চক্রবর্ত্তী। ভারতী ভবন, এক টাকা।

প্রথমেই ব'লে রাখি যে নিশিকান্তর কবিতার আমি অনুরক্ত। তাঁর 'পণ্ডিচেরির ঈশান কোণের প্রান্তর' ('কবিতা'য় প্রকাশিত) বাংলা গদ্য কবিতার মধ্যে একটি প্রধান রচনা ব'লে আমি মনে করি। কিন্তু এ-কবিতাটি 'অলকানন্দা'য় নেই; এ-গ্রন্থে লেখকের ছন্দের কবিতাই শুধু সংগৃহীত, তাও সব কবিতা নয়; তাঁর প্রাক্-পণ্ডিচেরি জীবনের কোনো রচনাই স্থান পায়নি, 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'টুকরি'ও না। বস্তুত, টাইটেল পেজ ও উৎসর্গ-পত্র থেকে সুরু ক'রে বইটির সর্বত্র একটি নিবিড় পণ্ডিচেরি-আবহাওয়া পরিব্যাপ্ত, এমনকি লেখকের নামের নিচে ব্র্যাকেটে 'শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম' কথাটি বসানো আছে, যাতে পাঠকের তাঁর গোষ্ঠী সম্বন্ধে ভুল না হয়। তাছাড়া, অনেকগুলো, এমনকি এক হিসেবে সব-গুলো, কবিতার বিষয়ও এক; যোগসাধনার ফলে লেখকের জন্মান্তর, শ্রীঅরবিন্দ ও 'শ্রীমা'র প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি—বিভিন্ন ছন্দে ও বিভিন্ন রূপকের সাহায্যে এই একই কথা তিনি বলেছেন। বইয়ের জ্যাকেটে প্রকাশকও জানিয়েছেন যে 'শ্রীঅরবিন্দের দিব্যস্পর্শে তাঁর কাব্য অপরূপ রূপ নিয়েছে।'

এ-অবস্থায়, শ্রীঅরবিন্দ, যোগসাধনা ও আধ্যাত্মিকতা বাদ দিয়ে নিশিকান্তর কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলা অশোভন ঠেকতে পারে, কিন্তু আমি, সত্যি বলতে, উপরি উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে নিতান্তই অজ্ঞ; তাছাড়া কবিতাকে ধর্মসাধনার একাধারে ফল ও উপায় হিসেবে না দেখে কবিতা হিসেবে দেখাই আমার মতে যুক্তিসঙ্গত। এবং কবিতা হিসেবে 'অলকানন্দা'র বেশির ভাগ রচনাই নিতান্ত অধার্মিক পাঠকেরও ভালো লাগবে সে-কথা জোর ক'রেই বলতে পারি। ছন্দে, বিশেষ ক'রে তিনমাত্রার ছন্দে, নিশিকান্তর নিশ্চিত, লঘু আধিপত্য পদে-পদে আমাদের প্রশংসা কেড়ে নেয়, কথা দিয়ে ছবি আঁকতে তিনি ওস্তাদ। কান

ও চোখ এ দুটি ইন্দ্রিয়ই তাঁর রচনা থেকে প্রচুর তৃপ্তি পায়। বইটি খুলেই যখন পড়ি—

অচিন্ত্যমুখ-উৎপল, ওগো যুগলভ্রমর-আঁখি দুটি!
ফুটি' তব সাথে তোমারি কুহুমে তোমারি অমিয় লব লুটি;

তখনই মন বিচিত্র ও নিবিড় উপভোগের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে ওঠে। আর যদিও 'নিস্তব্ধ বয়ান' কি 'জন্মদিন' কি 'পথিক' ছন্দের নৈপুণ্য ও একাধিক আকস্মিক ভালো লাইন সত্ত্বেও অতিভাষণে শিথিল, এবং শেষের দিককার 'ত্রিজন্ম' 'সন্তান' 'ভাস্বর' প্রভৃতি পয়ারে লেখা কবিতা ছন্দে গাঁথা ধর্মতত্ত্ব মাত্র, তবু মোটের উপর আমাদের প্রত্যাশা ব্যর্থ হয় না। 'পণ্ডিচেরির ঈশান কোণের প্রান্তরে' সে-গুণ সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য, এবং যা আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে নিশিকান্তর বৈশিষ্ট্য, তা এ-বইয়ের অনেক কবিতাতেই বর্তমান। সে-গুণ আর-কিছুই নয়—অদ্ভুত, সুদূর, অতি-প্রাকৃত ছবি আঁকবার ক্ষমতা, যে-সব ছবি আমাদের নিত্যপরিচিত জগতের নয়, তবু যেগুলোকে সত্য ব'লে না মেনে উপায় নেই। কবিতার আঙ্গিকে নিশিকান্ত বরাবর ঐতিহ্যকে মেনে চলেছেন, কিন্তু তাঁর কল্পনা খাপছাড়া, রাজপথ ছেড়ে বাঁকাচোরা অলিগলিতে ভ্রাম্যমাণ। 'গরুর গাড়ী' ও 'মহামায়া' এ দুটি কবিতাতেই তাঁর এই নিজস্বতা সব চেয়ে বেশী পরিস্ফুট।

চলে জীবনের দুর্গম কান্তারে
বঙ্কিত পথে পান্থ বৃষভযান,
প্রতি আবর্তে মুখরায় দুই ধারে
যুগল চাকায় ভারাক্রান্ত প্রাণ।
* * *
ওরি সাথে যেন অনন্ত কাল চলে
ধরি' সত্যের স্বর্ণ সম্ভার,
দিবস নিশার যুগল চাকার বলে
কোন্ সে উষার পানে বহে অভিসার।

শত শতাব্দী আবর্ত সংঘাতে
ভরে দিগন্ত আকুল আর্তনাদে,
তবু আনন্দ স্বপনের শিখা জ্বলে
উদয় সূর্য শশাঙ্ক তারকার।
('গরুর গাড়ী')

এই স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ছবিটি স্বতঃই আমাদের কল্পনাকে আবিষ্ট করে; আমরা প্রশ্ন করতে ভুলে যাই, নিঃশব্দে মেনে নিই। কিন্তু আরো বেশি বলশালী, চিত্ররূপে ঢের বেশি ঐশ্বর্যবান 'মহামায়া' কবিতাটি—যেখানে প্রায় কয়েক পংক্তি পর-পরই এক-একটি নতুন ছবি আমাদের মানসদৃষ্টিকে অভিভূত করে—অভিভূত করে, কারণ প্রতিটি ছবিই উজ্জ্বল ও আশ্চর্য। সমস্ত কবিতাটিই উদ্ধৃতির যোগ্য ('কবিতা'র পাঠকরা পুরোনো সংখ্যাগুলো ঘাঁটলে এটি খুঁজে পাবেন), কিন্তু কয়েকটি লাইন আছে যা উদ্ধৃত না-করলেই নয়। যেমন ধরুন—

দিগন্তরেখা দ্বিখণ্ড করি দাঁড়ায়েছে তালতরু

এ-লাইনটি সরলতা, ধ্বনি ও চিত্ররূপের সমন্বয়ে এতই সুন্দর যে প্রকাশক-ব্যবহৃত 'অপরূপ' বিশেষণটি প্রয়োগ করতে পর্যন্ত লোভ হয়; আর তার পরেই যখন পড়ি—

নেভে আর জ্বলে জোনাকি-যোনির শিখা,
মসীর সাগরে বহ্নির বুদ্বুদ।
অট্টহাসিছে রাতের অট্টালিকা
দ্বারে বাতায়নে বর্তিকা-বিদ্যুৎ।
সাদা আঁগুনের তরণীতে চাঁদ চলে,
তারার রূপালি তীরের ফলক ঝলে,
চাহে মার্জার চক্ষু মেলিয়া
মূষিক বিবর পাশে,
দৃষ্টিতে তার তিমির-দীর্ণ
সূর্যহীরক হাসে।

তখন সন্দেহ থাকে না যে নিশিকান্তর মধ্যে এমন মাল মশলা আছে যা দিয়ে বড়ো কবি তৈরি হয়। বেড়ালের চোখকে এমন একটি অর্থময় উপমা দিয়ে যিনি

৭

ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তিনি দেখতে জানেন—এবং দেখাতেও জানেন। নিশিকান্তর কবিতা যখন সব চেয়ে ভালো, তখন তা ভালো অর্থে জমকালো, কারণ অলঙ্করণে তিনি অকৃপণ—ও পারদর্শী। যে-সব কবিতায় ভক্তের অতল প্রশান্তি প্রকাশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য, সেখানেও 'গীতাঞ্জলি'র সরল স্বল্পভাষিতা নেই, তাঁর কবি-প্রকৃতি সন্ন্যাসীর নয়, বিলাসীর ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে ও ঝঙ্কৃত বাক্যচ্ছটায় তাঁর আনন্দ। 'স্ফটিকপাত্র', 'অগ্নিবাণ', 'অশ্রান্ত' এ-সব কবিতারও ধ্বনিকল্লোল আমার ভালো লাগলো।

স্ফটিকপাত্রের মত এ-সম্বিত রেখেছি ধরিয়া…
যায় দিন, যায় সন্ধ্যাবেলা,
রাত্রির আঁধার যায়, প্রভাতের স্বর্ণময় খেলা
আসে যায়, একে একে অসে যায় সুখের দুখের
ক্ষণগুলি, তারা যে মিলায়ে যায় মোর আনন্দের
সর্বভুক স্বচ্ছতায়।

('স্ফটিক পাত্র')

অব্যর্থ শরের মত চলিয়াছি আমি অনুক্ষণ
আমার লক্ষ্যের পানে।
হে ধানুকী! আমি তব তীর ;…
প্রিয়তম!
আমি তব প্রেম দিয়ে প্রজ্জ্বলিত শিখার শায়ক,
চুম্বকবহ্নিতে মোর প্রতি বস্তু, প্রত্যেক পলক
জ্ব'লে ওঠে।

('অগ্নিবাণ')

আরো একটু সংহত, শব্দের ব্যবহার আরো গাঢ় ও ইঙ্গিতময় হ'লে এ-সব কবিতা উল্লেখযোগ্য হ'তে পারতো।

এ-কথা যদি ঠিক হয় যে বড়ো কবির উপকরণ নিশিকান্তর মধ্যে আছে, তাহ'লে সে-উপকরণের তিনি কী-রকম ব্যবহার করেন তার উপরেই তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। পণ্ডিচেরির আশ্রমের প্রভাব তাঁর কবিপ্রকৃতির উপর

শেষ পর্যন্ত কতখানি শুভ হবে তা বলা শক্ত ; ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবার ফলে তাঁর পরিপ্রেক্ষিত ঈষৎ বিকৃত হওয়া অসম্ভব নয়, অর্থাৎ তাঁর রচনা সম্পূর্ণ গোষ্ঠীগত, অদীক্ষিতের-জন্য-নয় গোছের হ'য়ে পড়বার আশঙ্কা আছে। এ-কথা আমি আন্দাজে বলছি না, এর সামান্য আভাস 'অলকানন্দা'তেই পাওয়া যায়। সে যা-ই হোক্, এ-বইখানা, কবিতা যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের কাছে সর্বান্তঃকরণেই অনুমোদন করা যায়, এবং নিশিকান্তর গদ্যকবিতা সম্বলিত দ্বিতীয় গ্রন্থটির জন্যও আমাদের সাগ্রহ প্রত্যাশা রইলো।

এক বছরের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের আবির্ভাব যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি প্রীতিকর। এই অল্প সময়ের মধ্যে আর-একটি বই হবার মতো রচনা যাঁর কলম থেকে বেরোতে পারে তিনি যে কবিতার কারুশিল্পে একজন আন্তরিক পরিশ্রমী সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না, এবং তাঁর মগজের কারখানা যে সর্বদাই সক্রিয়, শুদ্ধ এই কারণে তাঁকে তারিফ করতে ইচ্ছে করে। তাঁর প্রথম গ্রন্থে আঙ্গিকের যে-সব দুঃসাহসী পরীক্ষা তিনি সুরু করেছিলেন, এখানে দেখছি তার দ্বিতীয় অধ্যায়, যদিও নিছক কৃতিত্বের বিচারে 'এক মুঠো' 'খসড়া'কে অতিক্রম করে না। এ-বইখানা অপেক্ষাকৃত ছোটো, দেখতে মনোরম, আর নামটিও চমৎকার মানিয়েছে। কবিতাগুলো বেশির ভাগ 'খসড়া'য় প্রবর্তিত অভিনব গদ্য ছন্দে লেখা, গদ্য যেখানে প্রায়ই ছন্দের ধ্বনিকে বাজেয়াপ্ত করে, লুকোনো আর বিচিত্র মিল থেকে-থেকে পাঠককে চমকে দেয়। আঙ্গিকের দিক থেকে অমিয়বাবু যে বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ছন্দে তিনি দক্ষ, তবু ছন্দকে পরিহার ক'রে তিনি কবিতার ভাষা ও রূপকল্প নিয়ে যে-পরীক্ষায় ব্যস্ত, তার ক্রমবিকাশ সাধারণ পাঠক না হোক্, অন্তত অন্যান্য কবিরা গভীর কৌতূহল নিয়ে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন।

অমিয়বাবুর আর-একটি বিশেষত্ব এই যে বাঙালি কবিদের মধ্যে তিনি প্রকৃতই কজ্‌মপলিটান। নতুন ও বিচিত্র ভূগোলের রস তিনি যেমন ক'রে পরিবেষণ করেন, এমন আর-কেউ করেননি। 'খসড়া'তে এর উদাহরণের অভাব নেই ; এ-বইতেও এরোপ্লেনে ওড়বার কবিতাটি উল্লেখযোগ্য :

ঝোড়ো কাঁচে
জর্মানীর উপর-হাওয়ায়
ভূমির ছবির ঘূর্ণি
এরোপ্লেনে
প্রাগ্‌ থেকে উড়ছি ড্রেসডেনে
নীচে দেখা যায় না পৃথিবী ঢেকে আছে
ওঠে শূন্য চূর্ণি

বিরতিচিহ্নহীন ছোটো-ছোটো লাইনে এরোপ্লেন-থেকে দেখা গতিশীল পৃথিবীর ছবি ধরা পড়েছে, সে-কথা মানতেই হবে। আর আকাশে ব'সে বিদেশের এলবে অরণ্য আর নিজের দেশের দিঘির পাড় মৃন্ময়ী বাড়িতে ভেদ মুছে যায়, কবির এ-অনুভূতিও পাঠকের মনে সংক্রামিত হয়। অমিয়বাবুর অনুভূতির ব্যাপ্তি বাস্তবিকই আন্তর্দেশিক, এমনকি আন্তর্জাগতিক। মঙ্গলগ্রহে ব'সে তিনি পার্থিব জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে জল্পনা করছেন:

আছি এখন মার্স-এ। দেউলে লাল বাতি জ্বালা।
মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।
দূরে শনির সোনার থালা;
নির্বাণপথের শূন্য।
এখানে কই
রেফ্রিজরেটরের দই।

এই আন্তর্জাতিকতার ঝোঁক কখনো আবার তাঁর রচনাকে ফিরিস্তির স্তরে নামায়, যেমন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। তাতে গোয়েরিং ফরাসী লাইন গঙ্গাফড়িং বড়োবাজার
হাতির পা, ধর্মযাজক, উত্যক্ত-বৃদ্ধ, ওয়ারস, বর্ণার্ড্‌শ, বর্মার হাজার
চুরোট, খুন, প্রহ্লাদ, জহ্লাদ, চাকরির দ্বন্দ্ব, হিন্দুমুস্‌লীম, নির্বিকল্প সমাধি, ব্যাধি
ইত্যাদি হরেক প্রকার।

('যুদ্ধের খবর')

বর্তমান জগতের, বাংলা খবর-কাগজের ভাষায়, 'ভীতিকর পরিস্থিতি' বোঝাবার এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও কার্যকরী উপায় নিশ্চয় অমিয়বাবুর জানা আছে? তবে

সুখের বিষয়, এ-রকম উদাহরণ 'এক মুঠো'য় বিরল। এবং এমনও নয় যে শুধু বিশ্বের সমস্যা নিয়েই তিনি ব্যস্ত। ঘরের কাছাকাছি তিনি যখন চোখ ফেরান তখন তাঁর দৃষ্টিতে আমাদের প্রতিদিনের অতি-পরিচিত অনেক জিনিস সুন্দরের দুর্লভতা পায়। আলো-ছায়ার খেলায় তাঁর নৈপুণ্য:

নদী। ঝলমল ক'রে কে গেল ল্যাম্পপোস্টের ছায়ায়
কম্পিত বাঁকে। তুমি।

('সেই পথ')

বিষণ্ণ পুকুরজলে চাঁদের ছায়া, ডোবা চাঁদের ফালি;

('সংসার')

নীল টালি গম্বুজের টালি
গ'লে গেছে দুপুরের হাওয়ায় ঝিল্‌মিল

('সঙ্গৎ')

শেষোক্ত কবিতায় পশ্চিমের শহরের সবজিমণ্ডির ভিড়ের উত্তপ্ত আবহাওয়া সকলেই চিনতে পারবেন, আর 'আরোগ্য' ও 'চিরান্ত' এ দুটি কবিতাও বিষয়ের প্রাচীনত্বে ও ভঙ্গির নতুনত্বে উপভোগ্য:

সেরে-উঠি-উঠি দেহ শোনে
পাড়ার পৃথিবীর আওয়াজ,
শব্দের বাণ্ডিল ডোবে মুগ্ধ কানে।…
তবু স্বাদু ভালো লাগে
রুটি মাখনের। মাছের ঝোল,
বিলিতি মাসিক, জমে-ওঠা ডাক,
চোখের জিভের খোরাক।

('আরোগ্য')

তবে এ-বইয়ের যে-কবিতাটি আমার সব চেয়ে ভালো লাগলো সেটি ঐতিহ্যগত ছন্দে লেখা, এবং তার বিষয় বাঙালি কবির সেই চিরাচরিত বর্ষা। এ-বিষয়টি, আমাদের অন্য অনেক কবির মতো, অমিয়বাবুকেও কখনো ক্লান্ত করে না ব'লে মনে হয়; কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব এইখানে যে বর্ষা সম্বন্ধে একাধিক উৎকৃষ্ট কবিতা

তিনি লিখতে পেরেছেন। 'বৃষ্টি' কবিতাটিতে আঙ্গিকের চমকপ্রদ নতুনত্ব কিছু নেই, কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় আছে :

> অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে ॥
> বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে,
> মরুময় দীর্ঘ তিয়াষার মাঠে, ঝরে বনতলে,
> ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
> শিরায় শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।

এ-পংক্তিগুলি অন্ধকার মধ্যদিনে গুনগুন ক'রে আবৃত্তি করবার মতো, কারণ এর ছন্দ বৃষ্টিরই ছন্দ। 'খসড়া'র অন্তর্গত 'মেঘদূত' নামক নতুন ভঙ্গির বর্ষার কবিতার সঙ্গে এ-কবিতাটি পাশাপাশি পড়লে কৌতূহলী পাঠকের শিক্ষা ও আনন্দ দুই-ই লবে।

বুদ্ধদেব বসু

রবীন্দ্র-রচনাবলী *

'মানসী'ই তাঁর প্রথম কাব্যপদবাচ্য গ্রন্থ, রবীন্দ্রনাথের এ-মতের সঙ্গে তাঁর সকল পাঠকই পরিচিত। সম্ভব হ'লে প্রাক্-মানসী সমস্ত পদ্যরচনা তিনি বিসর্জন দিতেন, অগত্যা প্রথম বয়সের রচনাগুলির পরিবর্তনে ও অংশছেদনে তিনি অক্লান্ত। এ-প্রক্রিয়ায় কোনো-কোনো কবিতার যথেষ্ট উপকার হয়েছে ; যেমন, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' মূল রূপ অপেক্ষা খর্বাকারে ঢের বেশি ভালো। কিন্তু সব কবিতার বেলায় এ-কথা খাটে না ; এবং ঊর্ধ্ব-সত্তরে সতেরো বছরের রচনা পালিশ করতে বসলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। আসলে, রবীন্দ্র-রচনাবলী এখন আর কবির একলার নয়, সমস্ত জাতিরই সম্পত্তি, এবং প্রতিভার উন্মীলন যেমন হৃদয়গ্রাহী, তার অঙ্কুরের উদ্‌গমও কৌতূহলদ্দীপক, এবং সাহিত্যশাস্ত্রের পণ্ডিতের পক্ষে, যে-সব রচনা কবি স্বয়ং বর্জন করতে পারলেই হয়তো খুসি হন, তার মৌল, অপক্ক রূপটাই লোভনীয় ; এবং তাঁর মতে সেই ছেলেমানুষির উপর পাকা হাতে সংস্কার করবার অধিকার কবির নিজেরও নেই। এ জন্যে পণ্ডিতকে পৌত্তলিকতার অপরাধে দায়ী করাও যায় না, কেননা বালক বয়সের রচনার যথেষ্ট সংস্কার করলেও পরিণত রচনার সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে না, অথচ তার আদিম সরসতা—যা তার কোনো-কোনো অংশকে হয়তো বরেণ্য করে—তাও সংস্কার-প্রক্রিয়ায় লুপ্ত হয়।

তবু এ-কথাও সত্য যে 'মানসী'র সঙ্গে রবীন্দ্র-কাব্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত। নবযৌবনসুলভ অস্পষ্ট কল্পনারাশি 'মানসী'তে স্পর্শসহ রূপ নিয়েছে, ছন্দের শৈথিল্য কেটে গিয়ে দৃঢ়তা দেখা দিচ্ছে, পূর্ববর্তী বইগুলিতে কবি যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন 'মানসী'তে যেন তা-ই পেলেন। অবশ্য উল্লেখযোগ্য ও বহু-উল্লিখিত, উদ্ধৃতিযোগ্য ও বহু-উদ্ধৃত পংক্তি 'কড়ি ও কোমলে'ও ইতস্তত ছড়ানো, যেমন—'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে', 'আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে

* রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে আছে : 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', 'কড়ি ও কোমল, 'মানসী', 'বিসর্জ্জন', 'রাজর্ষি', 'চিঠিপত্র', 'পঞ্চভূত', তাছাড়া ৮খানা চিত্র। দাম, ৪৷৷০ ৫৷০, ৬৷৷০ ও ১০৲। প্রকাশক, বিশ্বভারতী।

আসে বিশ্বের আকাশ', 'হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন মনে!' 'আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে কী জানি পরাণ কী যে চায়'; এবং এ-গ্রন্থে কোনো-কোনো গান একদা বাঙালিচিত্তকে লুঠ করে নিয়েছিলো। তাছাড়া 'কড়ি ও কোমলে'র প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনমাত্রার ছন্দ প্রথম রাবীন্দ্রিক মূর্তি পেলো এ-বইতে, ভাঙলো তার যুক্তাক্ষরের বন্ধন, যা ছিলো শৃঙ্খল তা হ'য়ে উঠলো নূপুর। যুক্তাক্ষরকে একমাত্রার বদলে দু'মাত্রার মূল্য দিলেই এ-ছন্দ অপূর্ব গতিশীল হ'য়ে ওঠে, এ-আবিষ্কার 'কড়ি ও কোমলে'রই, যদিও প্রথমটায় আবিষ্কারক স্বয়ং তার ব্যবহার সম্বন্ধে ভীরু ছিলেন, কারণ এটা দেখা যায় যে 'কড়ি ও কোমলে'র তিনমাত্রার কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব এড়িয়েই চলেছেন—অর্থাৎ তখন পর্যন্ত ছন্দের গূঢ় রহস্যটি তিনি খুঁজেই পেয়েছিলেন; ব্যবহার করেন নি। যখন তিনি 'মানসী'র কবিতাগুলি লিখলেন, যখন লিখলেন, 'নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি, বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি,' কিংবা

অতি অসহন বহ্নি-দহন
মর্মমাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্ক রাহু প্রতি পলে পলে
জীবন করিছে গ্রাস,

কিংবা

মোক্ষমূলর বলেছে "আর্য",
সেই শুনে সবে ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড়ো ব'লে করেছি ধার্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।

কিংবা

আমি কুন্তল দিব খুলে।
অঞ্চলমাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথ-নিবিড় চুলে।
দুটি বাহুপাশে বাঁধি নত মুখখানি
বক্ষে লইব তুলে।

তখনই তিন মাত্রার ছন্দে যুক্তাক্ষরের যথার্থ ও বিচিত্র ব্যবহারের উদাহরণ তিনি দেখালেন—উন্মুক্ত করলেন বাংলা কবিতার একটি বিরাট সম্ভাবনার দরজা। এ-ছন্দে আমরা এখন এতই অভ্যস্ত যে এর বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করা অনেকের পক্ষে শক্ত হ'তে পারে, কিন্তু এ কীর্তি যে কত বড়ো তা হেম বাঁড়ুয্যের 'বাজ রে শিঙা, বাজ এই রবে' পদ্যটি এখন একবার পড়লে বোঝা সম্ভব হ'তে পারে। রবীন্দ্রনাথের কানেই প্রথম যুক্তাক্ষরগুলো কুৎসিত শোনায়, কিন্তু প্রথমে বোধ হয় তিনি ভেবেছিলেন যে যুগ্মব্যঞ্জন যথাসম্ভব বাদ দিলেই সমস্যা চুকবে ('মানসী'তেও 'কে যেন আমারে এনেছে ডাকিয়া' কি 'বুঝেছি আমার নিশার স্বপন' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতায় যুক্তাক্ষর অনুপস্থিত কি বিরল); এ-ছন্দ পরিপূর্ণতার জন্য যে যুক্তাক্ষরের নিপুণ ব্যবহারেরই অপেক্ষা রাখে তা উপলব্ধি করতে রবীন্দ্রনাথেরও বেশ সময় লেগেছিলো।

আঙ্গিকের দিক থেকে, এবং ভাবের দিক থেকেও বটে, 'মানসী'কে রবীন্দ্র-কাব্যের মাইক্রোকজম্ বলা যায়। কোনো-একটি তীব্র, সমগ্রদেশকালব্যাপী প্রেম, যার উপলক্ষ্য কখনো মানবী, কখনো প্রকৃতি, কখনো বা এক অনির্ণীত ও অনির্দেয় বিশ্বসত্তা, 'মানসী'র বিভিন্ন কবিতায় নানা ভঙ্গিতে উচ্চারিত, ('তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার', 'নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি'), ঋতু সম্বন্ধে প্রথম সার্থক কবিতাও এ-গ্রন্থে মিলবে, ('বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী', 'এমন দিনে তারে বলা যায়') আর অন্যদিকে সমসাময়িক বঙ্গসমাজের প্রতি তাঁর বিদ্রূপের কটাক্ষ বারে-বারেই পড়েছে, যার চরম প্রকাশ 'মর্মে যবে মত্ত আশা সর্প-সম ফোঁসে'। এইভাবে সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যের মূল বিষয়গুলি 'মানসী'তে লভ্য, এবং তাঁর হাতে যে-সব ছন্দ কখনো বীণা, কখনো শঙ্খ হ'য়ে, মধুর কি গম্ভীর সুরে বেজেছে, সেগুলো প্রায় সবই এখানে দেখতে পাই, কোনোটি বিকশিত, কোনোটি প্রাথমিক অবস্থায়। বিজোড়মাত্রার যে যুক্তাক্ষরবর্জিত (কি সংবলিত) ছন্দে রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রধান কবিতা ও গান, তার প্রথম প্রকাশ 'মানসী'র তৃতীয় কবিতাটিতে:

৮

ছিলাম নিশিদিন   আশাহীন প্রবাসী,
বিরহ-তপোবনে   আনমনে উদাসী।

এ-কবিতাটি লেখবার সময় এই নতুন ছন্দের স্বভাব সম্বন্ধে কবি নিজেই যে খুব নিশ্চিত ছিলেন না তা এ থেকেই বোঝা যায় যে তিনি পাঠককে ব'লে দিয়েছিলেন যে 'এই ছন্দে যে যে স্থানে ফাঁক, সেইখানে দীর্ঘ যতিপতন আবশ্যক।' অথচ এই ছন্দই দ্রুত লয়ে বেজে উঠলো, যখন ও-কবিতাটি লেখবার মাসখানেক পরেই তিনি লিখলেন—

আবার মোরে পাগল ক'রে
দিবে কে?
হৃদয় যেন পাষাণ হেন
বিরাগ-ভরা বিবেকে।

তারপর এলো :

"বেলা যে প'ড়ে এল, জলকে চল্!"
পুরোনো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল!

তারপর :

তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!

এবং যুক্তাক্ষর বসালে যে এই ছন্দেরই লয়টা আরো বেশি দ্রুত হ'য়ে ওঠে তাও দেখা গেলো, যখন তিনি লিখলেন—

কলম-ঘায়ে ঊর্মি টুটে,
রশ্মিরাশি চূর্ণি উঠে,
শ্রান্ত বায়ু প্রান্ত নীর
চুম্বি যায় কভু।

এ থেকে 'মর্মে যবে মত্ত আশা সর্প সম ফোঁসে' মাত্র এক পদক্ষেপ দূরে।

সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হাতে পয়ারও মুঞ্জরিত হচ্ছিলো। আঙ্গিকের দিক থেকে 'মানসী'র আর-একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'নিষ্ফল কামনা'। অমিত্রাক্ষরে

কবির এই প্রথম রচনা বিভিন্ন পংক্তির অসমান দীর্ঘতায়, মিলের বর্জনে, উক্তির নাটকীয় ঝোঁকে কবিতাটিতে একটি শান্ত, গভীর সৌন্দর্য এসেছে যা আজও, যখন হাজার বারের পর আরো একবার কবিতাটি পড়ছি, আমাদের মুগ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের দুর্নিবার উচ্ছলতা এখানে অনেকটা সংহত। অথচ অমিত্রাক্ষর যে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভঙ্গি নয়, 'বিসর্জন' নাটকই তার প্রমাণ। স্বীয় প্রতিভার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আখ্যানের অন্য একটি ভঙ্গি তিনি 'মানসী'তেই উদ্ভাবন করলেন; পয়ার, যাতে আঁজাঁবমা আছে, কিন্তু মিলও আছে ('মেঘদূত' 'অহল্যার প্রতি')। বর্ণনার কিংবা আখ্যানের কবিতার জন্য এই ছন্দ যে 'পলাতকা'র আগে পর্যন্ত তিনি খুব বেশি ব্যবহার করেছেন তা আমরা সকলেই জানি। ('মানস সুন্দরী' কি 'দেবতার গ্রাসে'র উদাহরণ অনেকেরই সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়বে।) আঁজাঁবমা (enjambment, অর্থাৎ কাশীরাম-দাসী পয়ারের মতো এক-একটি চরণে এক-একটি বাক্য আবদ্ধ না ক'রে বাক্যগুলিকে একাধিক পংক্তিতে ও পংক্তির অংশে চালিয়ে দেয়া), যা অমিত্রাক্ষরের প্রধান গুণ, যার ফলে ও-ছন্দ নাটকীয় রূপ পায়, সেটি রবীন্দ্রনাথ রাখলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে মিলও রাখলেন, কারণ তাঁর প্রতিভা মূলত নাটকীয় নয়, গীতিকবিতার।

রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ যে লিরিকজাতীয় রচনাতেই, এই রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড অধ্যয়ন ক'রে আমার এ-বিশ্বাস আরো দৃঢ় হ'লো। 'বিসর্জন' নাটকের উৎসর্গে তিনি ঠাট্টা ক'রে লিখেছেন, 'কেহ বলে, ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক, লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি'; কিন্তু কথাটি সত্য, এবং আমার সন্দেহ হয় যে কবি নিজেও তা জানেন। 'বিসর্জন' অনেকটা ব্রাউনিঙের নাটকের মতো, যেখানে চরিত্র-চিত্রণ কিংবা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত অপেক্ষা লেখকের কবিত্বশক্তিতেই আমরা মুগ্ধ। ব্রাউনিঙের বেশির ভাগ কবিতার মতো 'মানসী'র 'গুপ্তপ্রেম' 'নারীর উক্তি' প্রভৃতি রচনা ড্রামাটিক লিরিক শ্রেণীতে ফেলা যায়, এবং রঘুপতি জয়সিংহ প্রভৃতির উক্তিতেও কোনো ব্যক্তিবিশেষের মনের কথা বলবার ছলে মানব-মনস্তত্ত্বের কোনো একটি সার্বজনীন ভঙ্গি উদ্ঘাটন করাই কবির উদ্দেশ্য। অর্থাৎ 'বিসর্জনে'র পাত্রপাত্রী ঠিক নাটকীয় চরিত্র নয়,

তারা মানুষের কোনো-না-কোনো শাশ্বত হৃদয়াবেগের, যথা দয়া কি শক্তিমত্ততা কি হিংসার, প্রতিভূ। তারা অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত সুবোধ্য, বড়ো বেশি একমুখো। যেমন ব্রাউনিঙের বৈয়াকরণ কি ডেল সার্টো আসলে কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, বিশেষ-এক জাতের মানুষের প্রতিনিধি, গোবিন্দমাণিক্য, রঘুপতি ও জয়সিংহও যেন তা-ই। অবশ্য নিজের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন ব'লে 'বিসর্জনে'র পর তিনি আর গতানুগতিক নাটকে হাত না দিয়ে ক্রমশ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর অপরূপ রূপক-নাট্য, যেখানে চরিত্র ও ঘটনা দুই-ই অবান্তর। 'ডাকঘর' ও 'রাজা' তাঁর নাট্যশিল্পের উচ্চতম যুগ্ম-চূড়া, এবং রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিচার করতে বসলে গ্রীক কি এলিজাবেথীয় কি আধুনিক ইওরোপীয় কোনো আদর্শই টিঁকবে না, কারণ নাটককে দিয়ে তিনি গানের কাজ করিয়ে নিয়েছেন, অথচ তার নাটকত্ব নষ্ট করেন নি। এর ব্যতিক্রম শুধু 'চিরকুমার সভা' (কেউ-কেউ হয়তো 'শোধ-বোধে'রও উল্লেখ করবেন) এবং 'চিরকুমার সভা' বাংলা ভাষার high comedyর দৃষ্টান্তস্থল।

সব চেয়ে যা উল্লেখযোগ্য তা এই যে লিরিকের প্রতি দুর্মর পক্ষপাত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধেও বরাবর ধরা পড়ে। 'পঞ্চভূত' প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা আশালতা সিংহ একবার লিখেছিলেন যে এ-রকম 'ফুল ফুটিয়ে তর্ক করতে' এক রবীন্দ্রনাথই পারেন। কথাটা সত্য; কি সমাজ কি স্বদেশ কি সাহিত্য যে-কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখনী ফুল ফোটায়, এ আমরা বার-বার দেখেছি। রচনাবলীর এ-খণ্ডে অন্তর্গত দুটি প্রবন্ধের একটি পত্রের, অন্যটি আলাপের আকারে; এবং কথোপকথন-ছলে প্রবন্ধ-রচনা যদিও প্লেটো থেকে অস্কার ওআইল্ড পর্যন্ত অনেকেই করেছেন, তবু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এর বিশেষ তাৎপর্য আছে। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্দেশ্য ছিলো প্রবন্ধের ভীতিকর চেহারা ঘুচিয়ে তাকে সরস, সাধারণ পাঠযোগ্য ও উপভোগ্য করা; তবে এ-ও সত্য যে কথোপকথনের রূপে যে-প্রসার ও মুক্তি পাওয়া যায়, তা তাঁর গীতি-প্রতিভাকে আকৃষ্ট করেছিলো। 'পঞ্চভূত' এমনভাবে লেখা যাতে উপস্থিত প্রসঙ্গের যুক্তিতে-বাঁধা সংকীর্ণ পথে আবদ্ধ থাকবার দরকার করে না, ইচ্ছে

করলেই এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানো যায়, এবং মৌল প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে না-এলেও চলে। কিছু বর্ণনা, কিছু জল্পনা ও কিছু খেয়ালের সঙ্গে মিশে এই প্রবন্ধগুলির চিন্তাশীলতা ও সারবত্তা এমন একটি মনোহর চেহারা নিয়েছে যা আজ পর্যন্তও একটুও ম্লান হয়নি; যে-কৌশলে রবীন্দ্রনাথ প্রতি বিষয়ে পাঠককে নিজের মতটা বুঝতে দিয়েও বিপক্ষের বক্তব্য যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন তাতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিও গভীরভাবে তৃপ্ত হয়। তবু এ-আপত্তি থাকে যে যুক্তির পর যুক্তি গেঁথে প্রবন্ধের যে-অনিবার্য, অনস্বীকার্য মীমাংসা, এখানে তা অনুপস্থিত; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ-আপত্তি তোলাই বৃথা, কারণ গদ্য তাঁর সর্বদাই কবিত্বময়, সর্বদাই আবেগবাহী, উপমায় ও রূপকে অলংকৃত, ধ্বনিবিন্যাসে ঝংকৃত। প্যাস্কেল কি সুইফ্‌ট্-এর মতো নির্জলা, নির্ভেজাল, একগুঁয়ে গদ্য লেখা তাঁর ধাতেই নেই। তাঁর গদ্য বরঞ্চ উনিশ শতকী রোমান্টিক ইংরেজি গদ্যের ধাঁচের, কিন্তু আমার তো মনে হয় না আবেগবাহী গদ্যের উৎকর্ষে ল্যাম কি ডিকুইন্সি কি অন্য কোনো ইংরেজ লেখকই তাঁর কাছাকাছি আসতে পারেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবির গদ্য, তার উপর মহৎ কবির গদ্য, এবং পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এটা আর কখনোই বোধ হয় দেখা যায়নি যে এত বড়ো কবি এত বেশি গদ্য লিখেছেন। 'কবিতার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে গদ্য মিশ্রিত করিলে আমার মতো গদ্যজীবী লোকের পরিপাকের পক্ষে সহজ হয়—কিন্তু গদ্যের মধ্যে কবিত্ব একেবারে অচল।' শ্রীযুক্ত ক্ষিতির এই মন্তব্যের সঙ্গে আধুনিক কবি এলিয়টের মতের মিল থাকলেও এ-মত নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের নয়।

'পঞ্চভূতে'র কথোপকথনের আকার রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থময় এই কারণে যে একটু অবকাশ, একটু প্রশস্ত জায়গা না-পেলে, কি গদ্যে, কি পদ্যে তাঁর সম্পূর্ণ স্ফূর্তি হয় না। যখন তিনি সরাসরি প্রবন্ধ লিখেছেন, তখনো, গানের আলাপের মতো, বিষয়টি আস্তে-আস্তে বিস্তৃত হয়েছে; ছোটো গল্পেও তা-ই। বিনা ভূমিকায় কাজের কথাটি পেড়ে বক্তব্য ফুরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি বিদায় নেন না; কিছু আগে আরম্ভ করেন, এপাশে ওপাশে অবাধ ভ্রমণ করেন, এবং

শেষ করেন প্রদীপের নিভে যাওয়ার মতো মন্থর লয়ে। নিছক ব্যবহারের দিক থেকে পল্লবগুলো হয়তো ছেঁটে ফেলা যায়, কিন্তু পল্লবগুলো নিজেরাই যখন এত সুন্দর, উপভোগের ও উপলব্ধির এত বড়ো সহায়, তখন তাদের বাদ দিতে চাইবে কোন্ বর্বর? এ-প্রসঙ্গে এ-কথাও বলতে হয় যে 'পঞ্চভূত' রবীন্দ্রনাথের গদ্য পরিণতির একটি স্তরে এসে পৌঁচেছিলো, এবং অনেক দিন পর্যন্ত এই গদ্যভঙ্গিই যে বাঙালি লেখকমাত্রেরই আদর্শ ছিলো তা আমরা কেউ-ই ভুলিনি। স্বয়ং শরৎচন্দ্র 'পঞ্চভূতে'র গদ্যভঙ্গিকে অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত আত্মসাৎ করেছিলেন—'সহসা', 'বারংবার' প্রভৃতি কথাগুলো পর্যন্ত চেনা যায়। এ-গদ্য-ভঙ্গি আমরা অতিক্রম করেছি খুবই সম্প্রতি—আর তার জন্যেও আবার রবীন্দ্র-নাথই অনেকখানি দায়ী।

অপরিসরতা রবীন্দ্র-প্রতিভার স্ফূর্তির অনুকূল নয় ব'লেই বোধ হয় সনেট তাঁর হাতে কোনোদিনই সে-রকম ভালো খোলেনি। 'কড়ি ও কোমলে'র চতুর্দশপদীগুলো সমসাময়িক অন্যান্য রচনার তুলনাতেই স্তিমিতজ্যোতি; মনে হয় চতুর্দশ চরণটিতে এসে যে থামতেই হবে, এই চেতনাতেই কবি অস্বস্তি বোধ করতেন। স্বল্প পরিসরে (সনেটের চেয়েও স্বল্প পরিসরে) তিনি যখন দিগ্বিজয় করেছেন, তা করেছেন গানে, যেখানে সুর তাঁকে এমন একটি উদার মুক্তি দিয়েছে, যা সহস্র কথারও অনধিগম্য। (অনেকে 'লিপিকা'র কথা বলতে পারেন, কিন্তু 'লিপিকা'র রচনাগুলিকে গদ্য-রচনার মধ্যে না ধ'রে কবিতার মধ্যেই ধরা উচিত, এবং কবিতা হিসেবে তাদের আকার নেহাৎ ক্ষুদ্র নয়।) বিশুদ্ধ লিরিকের সরলতা, স্বল্পভাষিতা, অজস্রতা—এ-সবই রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন পরিপূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়, তেমন পৃথিবীর অন্য কোনো একজন কবিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। গানই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ও সত্যই অতুলনীয় কীর্তি, এমন একটি মত অনায়াসেই পোষণ ও প্রতিপক্ষের তর্কের বিরুদ্ধে সমর্থন করা যায়।

বুদ্ধদেব বসু

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

ভাংচি : অনুপম গুপ্ত, চার আনা
ক্ষণিকা : শিবপ্রসাদ মুস্তফী, বারো আনা
অতনু : গৌরপ্রিয় দাশগুপ্ত, এক টাকা

এ বারে "কবিতা"র সমালোচনার জন্যে যে সব বই এসেছে দুর্ভাগ্যক্রমে তার মধ্যে খারাপ বইগুলোর ভারই আমার উপর পড়েছে। অবশ্য অনুপম গুপ্তের ১৬ পাতার বই হয়ত এর ব্যতিক্রম।

দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই; কারণ "অতনু" বা "ক্ষণিকা" সম্বন্ধে কী যে বলা যায় ভেবে পাওয়া কঠিন। "অতনু"র লেখক বার বার যদিও মনে করিয়ে দিতে চান যে তিনি কবিপদবাচ্য,—(যথা, "ক্ষুব্ধ কবি শুধাইছে তোমা" একটা কবিতায় তিনবার, বা "প্রস্তর ফলকে যাবে আঁকি এই কবি" ইত্যাদি)—তবু তাঁকে কবি ব'লে ভাবতে কষ্ট হয়। তাঁর কবিতার নিদর্শন একটা তুললেই পাঠক তা বুঝবেন—

"হে প্রেয়সী নিরুপমা তুলে চাহ আঁখি
তোমাকে কখন আমি দিই নাই ফাঁকি।"

"ক্ষণিকা"র উপর লেখা আছে—"এই কবিতাগুলির ইতিহাসের সঙ্গে যার পরিচয় আছে তাকেই দিলাম।" কবিতাগুলোও বড়ই ব্যক্তিগত। কবিতা private emotionকে আশ্রয় অবশ্যই করতে পারে, কিন্তু একটা সীমা ছাড়ালে মনোবিকলনের কেস্ হয়ে পড়ে। "ক্ষণিকা" প্রায় সেই সীমার কাছে গিয়ে পড়েছে। তা ছাড়া লেখকের ভাষা ও ভঙ্গি সে-কালের—জোলো এবং ঘোরালো। তবুও "অতনু" পড়ার পর এ বইটি পড়তে তত খারাপ লাগল না। মনে হল উক্ত দুই দোষ কাটিয়ে উঠতে পারলে মুস্তফী মহাশয়ের কাছে ভবিষ্যতে ভাল কবিতা পাওয়া যাবে হয়ত।

অনুপম গুপ্ত নতুন কবি নন। এর আগে তাঁর "পটভূমি" প্রকাশিত হয়েছে, এবং "কবিতা"র মারফৎ তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় প্রায়ই। তাঁর কবিতা কলাকৌশলের দিকে একান্তই আধুনিকতার চেষ্টা প্রয়াসী হওয়া সত্ত্বেও অগ্রাহ্য নয়। আর যাই হোক, তিনি আত্ম-সচেতন। নতুন ফর্ম আধুনিক কবিকে

খুঁজতে নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু সুরু করা উচিত প্রতিষ্ঠিত কোনো ভঙ্গির অনুসরণেই; নইলে বিপদ বাধে এই যে ভুঁইফোঁড় শোনায়। অনুপম গুপ্তর কবিতা থেকেই এ কথার সত্যতা দেখানো যায়। তিনি যেখানে প্রচলিত রীতির অনুগামী সেখানেই তাঁর কবিতা খারাপ হয় নি। যেমন—

মনে পড়ে
অনশন ক্লিষ্ট রাজবন্দীদের
আর্ত মুখচ্ছবি,
ভাবি—তবুও
সিনেমা নট নটী সংবাদে মুখর
ছাত্রদের অন্তর;
নিতান্ত নিয়মানুক্রমিক
আবার চলে কিছুদিন
কাগজের সম্পাদকের শোক গাথা
আর কর্ণোযালিশে...
সোল্লাস শোভাযাত্রার স্রোতকল্লোল শোনা যায়...

কিন্তু যেখানেই তিনি ভয়ানকরকম নতুন হতে চেয়েছেন সেখানেই তাঁর রচনা ব্যর্থ, যেমন—

তোমার ওই মুখ বাঁকানো
(ব্যাঘ্রীর মত পুরুষ-রক্ত পিয়াসী
বিকৃত ধারাল ঠোঁট)
তোমার ওই চোখ পাকানো
(পিশাচীর মত প্রতিহিংসাপরায়ণ
ক্ষিপ্র দৃষ্টি—)
ওতে আমি ভয় পাইনে।

এ সব বাদ দিলে অনুপম গুপ্ত হয়তো ভাল কবিতা লিখতে পারবেন।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক: বুদ্ধদেব বসু: সমর সেন; ৬১নং ধর্মতলা ষ্ট্রিট "রংমশাল প্রেসে"
শ্রীকানাইলাল গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশক: বুদ্ধদেব বসু
কার্যালয়—কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

কবিতা

পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা | আষাঢ়, ১৩৪৭ | ক্রমিক সংখ্যা ২২

আসা যাওয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে,
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিই নি আসন বসিবার।
বিদায় সে নিল যবে খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু ধেয়ে।
তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন,
দূর পথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা॥

২৮।৩।৪০

ক্ষণিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি
মনে মনে ভাবি, এ কি
ক্ষণিকের পরে অসীমের বরদান,
আড়ালে আবার ফিরে নেয় তারে
দিন হোলে অবসান।
একদা শিশিররাতে
শতদল তার দল ঝরাইবে
হেমন্তে হিমপাতে,
সেই যাত্রায় তোমারো মাধুরী
প্রলয়ে লভিবে গতি।
এতই সহজে মহাশিল্পীর
আপনার এত ক্ষতি
কেমন করিয়া সয়,
প্রকাশে বিনাশে বাঁধিয়া সূত্র
ক্ষয়ে নাহি মানে ক্ষয়।
যে দান তাহার সবার অধিক দান
মাটির পাত্রে সে পায় আপন স্থান।
ক্ষণভঙ্গুর দিনে
নিমেষ কিনারে বিশ্ব তাহারে
বিস্ময়ে লয় চিনে।
অসীম যাহার মূল্য সে ছবি
সামান্য পটে আঁকি
মুছে ফেলে দেয় লোলুপেরে দিয়ে ফাঁকি।

দীর্ঘকালের ক্লান্ত আঁখির উপেক্ষা হতে তারে
সরায় অন্ধকারে।
দেখিতে দেখিতে দেখে না যখন প্রাণ
বিস্মৃতি আসি অবগুণ্ঠনে
রাখে তার সম্মান।
হরণ করিয়া লয় তারে সচকিতে
লুব্ধ হাতের অঙ্গুলি তারে
পারে না চিহ্ন দিতে॥

১৫।১।৪০

মনোবীজ

জীবনানন্দ দাশ

জামীরের ঘন বন অইখানে রচেছিল কারা ?
এইখানে লাগে নাই মানুষের হাত।
দিনের বেলায় যেই সমারূঢ় চিন্তার আঘাত
ইস্পাতের নীল গড়ে—সেই সব সমুজ্জ্বল বিবরণ ছাড়া
যেন আর নাই কিছু পৃথিবীতে : এই কথা ভেবে
যাহারা রয়েছে ঘুমে তুলোর বালিশে মাথা গুঁজে ;—
তাহারা মৃত্যুর পর জামীরের বনে জ্যোৎস্না পাবে নাক' খুঁজে ;
বধির ইস্পাত-খড়্গ তাহাদের কোলে তুলে নেবে।

সেই মুখ এখনও দিনের আলো কোলে নিয়ে করিতেছে খেলা :
যেন কোনো অসঙ্গতি নাই—সব হালভাঙা জাহাজের মত সমন্বয়
সাগরে অনেক রৌদ্র আছে ব'লে ;—পরিব্যস্ত বন্দরের মত মনে হয়
যেন এই পৃথিবীরে ;—যেখানে অঙ্কুশ নাই তারে অবহেলা
করিবে সে আজো জানি ;—দিনশেষে বাদুড়ের-মতন-সঞ্চারে
তারে আমি পাব নাক' ;—এই রাতে পেয়ারার ছায়ার ভিতরে
তারে নয়—স্নিগ্ধ সব ধানগন্ধী পেঁচাদের প্রেম মনে পড়ে।
মৃত্যু এক শান্ত ক্ষেত—সেইখানে পাব নাক' তারে।

... ...

পৃথিবীর অলিগলি বেয়ে আমি কতদিন চরিলাম।
ঘুমালাম অন্ধকারে যখন বালিশে :
নোনা ধরে নাক' যেই দেয়ালের
ধূসর পালিশে
চন্দ্রমল্লিকার বন দেখিলাম
রহিয়াছে জ্যোৎস্নায় মিশে।

যেই সব বালিহাঁস ম'রে গেছে পৃথিবীতে
শিকারীর গুলির আঘাতে :
বিবর্ণ গম্বুজে এসে জড়ো হয়
আকাশের চেয়ে বড় রাতে ;
প্রেমের খাবার নিয়ে ডাকিলাম তারে আমি
তবুও সে নামিল না হাতে।

পৃথিবীর বেদনার মত ম্লান দাঁড়ালাম :
হাতে মৃত সূর্য্যের শিখা ;
প্রেমের খাবার হাতে ডাকিলাম ;
অঘ্রাণের মাঠের মৃত্তিকা
হয়ে গেল ;
নাই জ্যোৎস্না—নাই ক' মল্লিকা।

... ...

সেই সব পাখি আর ফুল :
পৃথিবীর সেই সব মধ্যস্থতা
আমার ও সৌন্দর্য্যের শরীরের সাথে
মমির মতনও আজ কোনোদিকে নেই আর ;
সেই সব শীর্ণ দীর্ঘ মোমবাতি ফুরায়েছে
আছে শুধু চিন্তার আভার ব্যবহার।
সন্ধ্যা না আসিতে তাই
হৃদয় প্রবেশ করে প্যাগোডার ছায়ার ভিতরে
অনেক ধূসর বই নিয়ে।

চেয়ে দেখি কোনো এক আননের গভীর উদয় :
সে আনন পৃথিবীর নয়।

দুচোখ নিমীল তার কিসের সন্ধানে,?
সোনা—নারী—তিষি—আর ধানে
বলিল সে : কেবল মাটির জন্ম হয়।
বলিলাম : 'তুমিও তো পৃথিবীর নারী
কেমন কুৎসিত যেন—প্যাগোডার অন্ধকার ছাড়ি
শাদা মেঘ-খরশান বাহিরে নদীর পারে দাঁড়াবে কি,?'

'শাণিত নির্জ্জন নদী' বলিল সে, 'তোমারি হৃদয়
যদিও তা পৃথিবীর নারী—নদী নয় :
তোমারি চোখের স্বাদে ফুল আর পাতা
জাগে না কি ? তোমারি পায়ের নিচে মাথা
রাখে না কি ? বিশুষ্ক—ধূসর—
ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকার কবিদের স্তর
যেন তারা ;—অপ্সরা—উর্ব্বশী
তোমার আকৃষ্ট মেঘে ছিল না কি বসি ?
ডাইনীর মাংসের মতন
আজ তার জঙ্ঘা আর স্তন;
বাদুড়ের খাদ্যের মতন
একদিন হয়ে যাবে ;
যে সব মাছিরা কালো মাংস খায়—তারে ছিঁড়ে খাবে।

কান্তারের পথে যেন সৌন্দর্য্যের ভূতের মতন
তাহারে চকিত আমি করিলাম ;—রোমাঞ্চিত সুপ্রজনন
বলে গেল : 'তক্ষিত সৌন্দর্য্য সব পৃথিবীর
উপনীত জাহাজের মাস্তুলের সুদীর্ঘ শরীর
নিয়ে আসে একদিন, হে হৃদয়,—একদিন
দার্শনিকও হিম হয়—প্রণয়ের সম্রাজ্ঞীরা হবে না মলিন ?'

কল্পনার অবিনাশ মহনীয় উদ্গীরণ থেকে
আসিল সে হৃদয়ের। হাতে হাত রেখে
বলিল সে। মনে হ'ল পাণ্ডুলিপি মোমের পিছনে
রয়েছে সে। একদিন সমুদ্রের কালো আলোড়নে
উপনিষদেরও শাদা পাতাগুলো ক্রমে ডুবে যাবে ;
ল্যাম্পের আলো হাতে সেদিন দাঁড়াবে
অনেক মেধাবী মূর্খ স্বপনের বন্দরের তীরে ;
যদিও পৃথিবী আজ সৌন্দর্য্যেরে ফেলিতেছে ছিঁড়ে।

... ...

প্রেম কি জাগায় সূর্য্যকে আজ ভোরে ?
হয়তো জ্বালায়ে গিয়েছে অনেক—অনেক বিগত কাল।
বায়ুর ঘোড়ার খুরে যে পরায় অগ্নির মত নাল
জানে না সে কিছু,—তবু তারে জেনে সূর্য্য আজিকে জ্বলে।
চীনের প্রাচীর ভেঙে যেতে-যেতে—
চীনের প্রাচীর বলে :
অনেক নবীন সূর্য্য দেখেছি রাতকানা যেন নীল আকাশের তলে ;
পুরোনো শিশির আচার পাকায় আলাপী জিভের তরে ;
যা কিছু নিভৃত—ধূসর—মেধাবী—তাহারে রক্ষা করে ;
পাথরের চেয়ে প্রাচীন ইচ্ছা মানুষের মনে গড়ে।
অথবা চীনের প্রাচীরের ভুল—চেনেনি নিজের হাল ;
কিম্বা জ্বালায়ে গিয়েছে হয়তো অনেক বিগত কাল ;
অগ্নিঘোড়ার খুরে যে পরায় জলের মতন নাল
জানে না সে কিছু,...তবু তারে জেনে সূর্য্য আজিকে জ্বলে ;—
ববিনে জড়ানো মিশরের মমি কালো বিড়ালকে বলে।

বর্ষার কাব্য

হেমচন্দ্র বাগচী

পৌরাণিক একটি আখ্যায়িকাকে
কি ক'রে সরল সহজ ভাষায় একটি পরিচিত রূপ দেওয়া যায়
ভাব্‌ছি—
এমন সময় শুনি
নববর্ষার মেঘমৃদঙ্গরোল,
আর, তাকিয়ে দেখি
ময়ূরের পাখার অগ্রভাগের মত চিক্কণ ঘনশ্যাম বারিভারাতুর মেঘ
আর শুনি ঘন বরষণের বিরামহীন রিমিঝিমি!
মনে হ'ল সেই চিরকালের বর্ষা এসেছে
অতি গম্ভীর অপরূপ তা'র শ্রী-সমারোহ—
একেবারে 'রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'!

বর্ষা যেন স্বয়ম্প্রকাশ, সে স্বয়ম্ভু!
সে যেন এসেই বলে, 'অয়ম্ অহং ভোঃ!'
বিংশ শতাব্দীর পীড়িত মস্তিষ্ক নিয়ে
আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে থাক্‌তেই হয়!
হাতের কাছে কোন অর্ঘ্য মাঙ্গলিক নেই,
তবু মন বলে, তোমাকে চিন্‌লাম,
হে চিরকালের কবি-হৃদয়ের বন্ধু!
মেঘদূতের টুক্‌রো টুক্‌রো লাইন মনে আসে,
জয়দেবের ললিত মধুর কাব্য, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী,
ছায়ানিবিড় তমালবনে রাধিকার অভিসার,
আর, রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান,—'এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে!'

সমুদ্রতরঙ্গের মত উচ্ছ্বসিত নববর্ষার মেঘ,
আমার দৃষ্টিসীমার আকাশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত
তা'রই নীচে, ধরিত্রীর উদ্বেলিত চঞ্চল সবুজ প্রাণলীলা!
সত্যেন্দ্রনাথের অতিকোমল কাজরীগাথার ছন্দদোলা মনে আসে—
'এস আজি বাদলবায়ে ঝুলন ঝুলা'বে!'
আর, মনে পড়ে প্রাচীন নাটকে বসন্তসেনার বর্ষা-অভিসার!

আমার মন বলে, তোমাকে দেখেছি বর্ষা
একটি সুন্দরী কিশোরী বালিকার মত
আমার গ্রামের পথে পথে
কদম্বরেণু ছড়িয়ে দিচ্ছে
ধারাস্নানশীতল শ্যামল দূর্ব্বার উপর।
বাতাসের দোলা লাগে কদম্বের ডালে ডালে পাতায় পাতায়!
আর, যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন সবুজ পল্লবের একাকারতা!
আর, তা'দের সঘন আন্দোলন,
আর, তোমার মধুর অনুকম্পা!
তারপর, দেখেছি তোমাকে বর্ষা,
কতদিন—পথে ঘাটে, নির্জ্জনে, ট্রেনে,
খোলার বস্তিতে, বিরাট নগরীর সরীসৃপ রাজপথে,
একাকী মুখোমুখী নির্জ্জন নদীতীরে,
কাশের বনে বনে!
দানবীয় শহরের অলিতে গলিতে
ফুলওয়ালা হেঁকে যায়
শুনেছি কতবার
'ফুল চাই, চাই কেয়াফুল!'

কত মধুর করুণ স্মৃতিতে, কত করুণ মুখের ডোলে,
কত আলোয় ছায়ায়, বিরহে মিলনে,
সমাপ্ত, অসমাপ্ত জীবন-কাহিনীতে,
স্মৃত-বিস্মৃত জীবনধারার বাঁকে বাঁকে—
স্বপ্নাতুর চোখে দেখেছি তোমায় কতদিন !

কালিদাসের কাব্য থেকে আধুনিক কাব্যের সীমায়
তোমার কত বেশ, কত বিস্ময় !
প্রতিদিনের অনুভবে, প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে মিশে মিশে
কবি-মননে তোমার যে একটি অখণ্ড রূপ, তা' আজ দেখ্‌লাম।
আর শুন্‌লাম তোমার গুরু গুরু মৃদঙ্গরোল !
অকস্মাৎ প্রাণমন পরিপূর্ণ ক'রে
তোমার আবির্ভাব—
একেবারে যেন 'রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।'

তারপরে ভেসে যাই, হারিয়ে যাই, ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাই।
মনে রাখা যায় না তোমার সেই শ্যামল রূপ—
আবার, আকাশের দিকে তাকাই !
এক ফালি ক্লান্ত, অবসন্ন রৌদ্র এসে পড়েছে
দালানের সমুখে, চৌবাচ্চার পাশে,
এঁটো বাসন-কোসনগুলোর উপরে,
তা'রই সমুখে শ্বাসরোধী উঁচু দেওয়াল
তেতলা পর্য্যন্ত উঠে গেছে
তা'রই উপরে তোমার পদচিহ্ন দেখি,
সিক্ত শেহলায় তোমার ধারাসিঞ্চনের স্নেহ :
রৌদ্রবঞ্চিত একটি বটের চারায় একটি নূতন অঙ্কুর—
মনে হয়, সময় নেই—
'কবে তুমি আস্‌বে ব'লে রইব না ব'সে!'

বর্ষশেষ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সারাদিন প্রহরে প্রহরে
বিষণ্ণ সহরে
স্বর্ণরূপা দোকানের রূপহীন ধ্বনি
শুনি।
টুক্‌টাক কাজ। টুকটাক। ঠুকঠাক। ঠকঠক কাজ
বিষাক্ত বিরক্তি শুধু। তন্দ্রায় পড়ে যেন বাজ।
শেষহীন
সারাদিন
রূপহীন
ধ্বনি
শুনি।

পৃথিবীর জীর্ণতাকে ঢেকে দিলো হঠাৎ চৈত্রেরা
চৈত্রবেলা। অপরূপ
অপরূপ। রূপ আর রূপা, রূপা আর রূপ!
অপরূপ
পাতাকাটা তৈলসিক্ত মানুষীর ভিড়
অস্থির।

সন্ধ্যা আসে
সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোত মনে পড়ে
স্রোত !
জীবন-যৌবন-ধন-মান ভেসে যায়
ভেসে যায় স্রোতে

পৃথিবীর ত্রিবলী রেখাতে :
মসৃণ মসৃণ !
ঊর্দ্ধাকাশে
চিম্‌নি-বিদ্ধ ধূম-রুদ্ধ অপরূপ বর্ণহীনতায়
মহাকাল হাসে।
প্রহরের বস্ত্রহীন বিবর্ণ শবেরা
সন্ধ্যার শ্মশানঘাটে। কূটগ্রন্থি নেই। কটুগন্ধ শুধু

তখনো
কুব্জদেহ ন্যুব্জপিঠ মানুষের ঝুঁকে-পড়া একাগ্রতা
তখনো
হাপরের হুসহুস শ্বাসটানা হাঁপানী তখনো
ঠুকঠুক ঠকঠক
রূপা আর সোনা
সোনা আর

আর তরল আকাশ।
সময়কে চিরে এলো রাত্রির নটী :
তৈলাক্ত মুখ নয়
ব্রণ আর বসন্তের বিক্ষত রেখায়
প্রৌঢ় ; তবু প্রৌঢ় নয়
তবু নটী ;
ক্ষীণকটি ?
আকাশ জানে না।

বর্ষে বর্ষে স্বর্ণভরা
উর্ব্বরা
পৃথিবী। পালে পালে পঙ্গপাল
বিপুলা পৃথিবী আর নিরবধি কাল
কাল, হে মহাকাল।

বর্ষশেষ। পিছনে কালের দূত। উদ্যত বর্শায়
রৌদ্র বিঁধে যায়
সূর্য্য চমকায়

আকস্মিক

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

হৃদয়-গহনমূলে ফুটে ওঠে শিশিরার্দ্র সবুজ সরস
একটি গোলাপ, বহু খরদগ্ধ দিবসের বিলাপ অলস।
সায়াহ্নের পদপাতে কেন্দ্রচ্যুত সজল শিহর
পত্রালীর ম্লানাকাশতলে তোলে পেলব মর্ম্মর।

সোনালি আঙুল দিয়ে সকৌতুক বাতাস দোলায়
শীতের বিশিত রাতে তুষারের শাণিত খেলায়
মুছে নেয় সব রাঙা-হলুদের রঙের সম্ভার
ভরে দেয় অজানিতে অনাগত চৈত্রের ভাণ্ডার।

যে পরশে আসে-যায় রূপ রস সৌরভের ডালা
বিহ্বল গোধূলি-নভে বলয়িত কাকলীর মালা
যে গূঢ় মাধুরী জাগে সুকেশীর সুরভিত শিরে
তাহারে পাবে না খুঁজে নিত্যবাহী মন্দাকিনী তীরে।

কোথা যে গোপনে থাকে, কেন বা সে দেখা দেয়, কেহ নাহি জানে
অনুগত অনুভূতি চকিত স্ফুরণে শুধু তারে ধরে আনে।

কু-সানের অর্হৎ

সুরেশচন্দ্র সরকার

পীতপত্র কু-সানের বন :
অর্হৎ স্খলিত গীত গায়।
শীর্ণ, জীর্ণ চৈত্যশাখে কাক
এক টানা ক্লান্ত ডেকে যায়।
রিক্ত ক্ষেত্র ; সোনার স্বপন
দূর স্মৃতি পশ্চিম-সীমায়।
ভাবে বৃদ্ধ, কেন ছাড়ে ডাক
একা কাক মলিন সন্ধ্যায়।

যেদিকে ফিরায় দু'নয়ান,
শূন্য মাঠ, ধূলো উড়ে যায় ;
শীতপাংশু রবি লম্বমান
শরকীর্ণ, দূর দীর্ঘিকায় ;
হিম হিম উত্তর হাওয়ায়
হানে ঝিল্লী তীব্র, তীক্ষ্ণ তান ;
ধাপে ধাপে উচ্চে তুলি' গান
শ্রান্তকণ্ঠ উৎক্রোসা ঘুমায়।

পৃথিবীর বিগত যৌবন,
বিনিঃশেষে প্রাণরস তা'র :
উলূকের স্থবির পাখায়
নামে শীত নীরবসঞ্চার।

ভরি' মুখ কুঞ্চন-রেখায়
মণিপথে লিপ্তবিলোকন,
কাতর অর্হৎ গাহে, 'মার !
দীর্ণ তোর মায়ার স্বপন।'

কু সানের গম্ভীর পাহাড়ে
কাঁপে হিম কুহেলীবিতান।
শীতরিক্ত নির্জন বিহারে
অর্হৎ স্খলিত গাহে গান।
আসন্ন কি বাঞ্ছিত নির্বাণ ?
ভাবে বৃদ্ধ ; সভয়ে তাকায়,
শোনে, শীর্ণ শীতের শাখায়
জীর্ণ কাক গাহে ক্লান্ত গান।

ফাল্গুন

অশোকবিজয় রাহা

ছিটকিনি নড়ে উপরের জানালায়,
একটু কবাট ফাঁক,
চুড়ির ঝিলিকে একটু আলোর চিড়,—
দুইখানি সাদা হাত :
দুইটি কবাট দুইদিকে স'রে যায়।
গোধূলির আলো পাখা ঝাপটায় চোখে মুখে বুকে এসে,
ধূ-ধূ হাওয়া খেলে এলোচুলে, পর্দায়।

নদীর ও-পারে আকাশে আবির-ঝড়,
আল্‌তা গলেছে জলে,
হাওয়া-জানালায় চোখে মুখে কাঁপে ঝিকিমিকি আবছায়া,
ধূ-ধূ হাওয়া এলোচুলে,—

দূরে এক কোণে পলাশের ডালে আগুন লেগেছে চাঁদে।

পুরানো পৃথিবীর প্রতি

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বিদায়, বিদায় আজ, হে পৃথিবী, সমুদ্র-সন্তান !
স্থবির শতাব্দীশেষে লহো এই শেষ সম্ভাষণ।
তোমার জীবন থেকে পলাতক আরক্ত যৌবন।
তোমার জীবন হ'তে গেছে মুছে যৌবনের গান।
কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই যদি জানি পিতা-পিতামহ
একদা সহস্র দীপে সাজায়েছে চরণ তোমার।
কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই যদি জানি তাঁদের আগ্রহ
একদা তোমাকে ঘিরে রচেছিলো কীর্ত্তি প্রতিভার।

আজ তুমি নির্ব্বাপিত মোর কাছে তুহিন অসাড়।
নতুন যুগের সূর্য্য সহ্য আর হয় না শরীরে—
বোধ করি তাই লুপ্ত হবে তুমি কালের তিমিরে,
তোমার সমাধি-স্তূপে নব্য কোনো সমাজ আবার।
তোমার মৃত্তিকা মাঝে এ যুগের দীপ্ত সাম্যগান
পরিণামে হবে জয়ী, জয়ী হবে পথের আহ্বান॥

ভোর

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

দূরের অখ্যাত গলি হতে ভেসে আসে
মাল আর ময়লা-টানা শকটের
একটানা ঘর্ঘরানি,
উষাচারীদের পায়ের আর গলার শব্দ
ভোরের হাওয়া।

রাত মিলিয়ে যাচ্ছে কর্পূরের মত
লেপের প্রগাঢ় প্রলেপে যাকে ঢেকে রেখেছিলাম,
মিলিয়ে যাচ্ছে অলস এলোমেলো ভাবনা
কবিতার লাইন টুক্‌রো টুক্‌রো
আর শেষ রাতের পাতলা তন্দ্রা
লেপের প্রগাঢ় প্রলেপে যাদের ঢেকে রেখেছিলাম।

ঝিনুক

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নানা রঙের ছিট লাগা
একটা ঝিনুক পেয়েছি কুড়িয়ে
চমৎকার ডুটি খোলা।
ভাবছি এর আড়ালে এমন কিছু কি লুকিয়ে নেই
যা চমৎকার-তর ?

ভেঙে দেখলে হয়।
কিন্তু ভয় হয় ভাঙতে,
কি থাকবে কি জানি
হয়তো কিছুই থাকবে না
খোলা ডুটিও যাবে।

তার চেয়ে ভীরুতার আড়ালে
ঢাকা পড়ে থাক আমার লোভ,
খোলার আড়ালে
বিচিত্র সম্ভাবনা।

বিলাসী

রবীন্দ্রনাথ সরকার

আকাশে অকৃপণ নির্ম্মম নীল,
আলুলায়িত নীলিমা, ব্যবধানহীন,
লঘু পাখা মেলে সাদা মেঘ উড়ে যায়—
সাদা মেঘ ছুঁয়ে মন্থর কালো চিল।

গোল-দীঘি জলও উচ্ছল হ'লো যেন।
রৌপ্য-আলোয় মদির নীলাভ জল—
সমুদ্র গূঢ়;   বুকে ভাসে চলমান
সাদা মেঘ আর কালো চিলেদের ছায়া।
তুমি বসে আছো ওপাশের জানালায়
উদাস দৃষ্টি উধাও দূরান্তরে,
নীলাম্বরীতে বেষ্টিত তনুলতা
বক্ষে পড়েছে তির্য্যক ফালি রোদ।

তোমার মনের মোহবিস্তারী মায়া
প্রতিবিম্বিত হ'লো কি শুভ্র দেহে ?
মর্ম্মর-স্তন মানে না বসন-কারা
অন্তর্লীন আলোতে দৃশ্যমান।

কোন কামনার আলো করে ঝলমল
পাকে পাকে ঘেরা নীলাম্বরীর তলে।
দিবসের ঐ উদাস নয়ন মাঝে
রাতের চপল আগুন রয়েছে ঢাকা।

দিনে মসৃণ নিস্তরঙ্গ মন,
ভালোবাসি তার দিগন্তলীনতাকে
রাতে ভালোবাসি উছল দৈহিকতা
দৃপ্তে টুটে যায় নীলাম্বরীর বাধা।

বরণীয়

নিশিকান্ত

এক আকাশে কেউ কি দেখে যুগল চন্দ্রমাকে ?
উদয় অচল কোনোদিন কি যুগল সূর্য রাখে ?

মালঞ্চে কি দুই বসন্ত কভু আসে ?
অযুত কুসুম অযুতরূপে সেথায় হাসে ;
তবু তাদের সবার বুকের মধ্যে লিখা
একটি স্বরূপ, একটি বিকাশ-বাসন্তিকা।
বিশ্বের বৈচিত্র্যালোকের চিত্রমাঝে
কেবল শুধু একটি মোহন মূর্তি রাজে ;
অযুতরূপের মর্মে পশি' চিনতে হবে তাকে।
এক আকাশে কেউ কি দেখে যুগল চন্দ্রমাকে ?

২

প্রাণী অনেক হোতে পারে। প্রাণ কি অনেক হয় ?
লক্ষ-লক্ষ শিখার মধ্যে একটি অগ্নি রয়।

ঐ পতঙ্গ লোহিত অঙ্গ ; ঐ যে পাখী
এল শ্যামলবরণপাখায় পরাণ ঢাকি' ;
ঐ যে হরিণ অরণ্যে যায় চুপি' চুপি' ;
ঘাড়ের করাত রঙিন করে বহুরূপী ;
ঐ যে কিরাত আসে বর্শাফলক তুলে ;
ঐ যে শিশু মায়ের দোলায় উঠল দুলে ;
একটি জাগরণেই ওদের দৃষ্টি মুক্ত হয়।
লক্ষ-লক্ষ শিখার মধ্যে একটি অগ্নি রয়।

৩

একের কথা শোনার পথে বিমুখ হোল যারা ;
তারা শুধুই মিথ্যারে চায়, পায় না কিছুই তারা।

তারা তোমায় বোলতে বলে নতুন কথা !
গোলাপফুল কি ফুটিয়ে দেবে মল্লি-লতা ?
সৃষ্টিছাড়া নতুন আবার কেমনতরো ?
তুমি যে ভাই চিরন্তনের লীলায় ধরো ;
চিনতে যদি না চায়, তারা অন্ধ তবে।
তাদের আবোল তাবোল শুনে কীইবা হবে ?
তাদের শুধুই কথার তর্ক ; তোমার বাণীর ধারা।
তারা শুধুই মিথ্যারে চায়, পায় না কিছুই তারা

৪

সকল সম্পদের মালিক, সে যে গো এক ধনী ;
সকল মণির চাইতে উজল সে যে একটি মণি।

সেই মণি যে পরশ-মণি তোমার প্রাণে ;
সেই ধনী যে রতন বিলায় তোমার গানে।
যাদের প্রাণে লাগবে তোমার প্রাণের খেলা,
তাদের ঘিরে দুলবে যে গো সোনার বেলা।
যাদের কণ্ঠে তোমার সুরের সুধা ঝরে,
তারা যে ভাই এই বসুধায় স্বর্গ ধরে ;
তারা জাগায় চির-উদয়-আলোর জয়ধ্বনি।
সকল মণির চাইতে উজল সে যে একটি মণি।

৫

অযুত-কোষের মধ্যে থাকে একটি মুক্ত অসি,
অযুত গণ্ডী খণ্ড কোরে ওঠে সে উল্লসি'।

দীপ্তি তাহার প্রকাশ কোরতে চায় না যারা ;
লুকায় তারে অন্তরালে, ভীরু তারা !
তারা কি কেউ তোমার প্রকাশ সইতে পারে ?
তোমার প্রোজ্জ্বলন্তবাণী বইতে পারে ?—
বইলে পরে, তাদের গ্রন্থিময় মালিন্য
তোমার কৃপাণ এক মুহূর্তে কোরবে ছিন্ন ;
তাদের অবোধ-বাধার মুণ্ড যাবে তখন খসি'।
অযুত গণ্ডি খণ্ড করে একটি মুক্ত-অসি।

৬

সত্য কি আর তিনটে চারটে ! সত্য অদ্বিতীয়।
কবি আমার ! স্বরূপ তোমার বিশ্ব-বরণীয়।

শুনছ কেন ওদের মুখের মিথ্যে বুলি ?
যারা তোমার গায় ধূলি দেয়, তারাই ধূলি !
মূর্ত কোরে রাখো তোমার সত্য-শিখা,
লুপ্ত হবে ধূম্রধূলির মরীচিকা ;
সর্বজয়ী আলোয় তারা খুলবে আঁখি,
তোমার ছন্দে হ'বে তোমার অনুরাগী ;
তোমার রূপেই অর্ঘ লবে বিশ্ব-বরণীয়।
সত্য কি আর তিনটে, চারটে ! সত্য অদ্বিতীয়।

অডেনের 'স্পেন' কবিতার অনুসরণে
(অংশ)

অনুপম গুপ্ত

উপনিবেশের মরুতে রেলপথ গঠন,
মানুষের জন্মরহস্যের আদিমতম বক্তৃতা
—সে-সব গত কাল।
এখন সংগ্রাম শুধু।

গ্রীসের কী মূল্য !
বীরের মৃত্যুর উপর যবনিকা
আর রেখে দাও অস্তগামী সূর্যের বন্দনা তোমার—
শুধু পাগলের প্রলাপ।
আজ সংগ্রাম কেবল।

কোনো কবি যেমন জানায়—মর্মরিত পাইন
অথবা যেখানে গান করে ঝরনা
'নাবিকের জীবনের জন্যে আমার একান্ত কামনা' ;
আবিষ্কারক খোঁজে তার যন্ত্রে
মানুষের অগম্য প্রদেশ
অথবা প্রকাণ্ড ধ্রুবতারা নিঃশেষ।
কিন্তু আমি খুঁজি আমার বন্ধুদের জীবন, তাই আমি খুঁজি।

গরীবরা ভাঙা বস্তিতে
হাত থেকে খসে পড়ে বিকেলের কাগজ
'আমাদের দিন গেল বৃথা,
তোমরাই তো হত্যা-কর্তা,
আবার স্রষ্টাও তোমরা,
আমাদের জীবনকে একটু সহজ করো।'

সমস্ত ক্রন্দন জমা হয়ে জ্বালায় জীবনকে :
কোনো বিশিষ্ট উদরের পূর্ত্তি
আর যোগায় তাদের রাত্রির ফুর্ত্তির বিভীষিকা :
শয়তান আর শ্বাপদ রুখে আসে।

হে পরাজিত জীবন,
আপ্রাণ প্রতিবার করো
'নড়ব না আমি—কিছুতে না,
দেব না ধরা তোমার শাণিত নখরে আজ'
স্বীকার আজ তুমি করবেই
আমার প্রকৃত জীবন—
আমাতে তোমার সব কিছু :
তোমার হাসি আর কান্না,
উন্নতি তোমার। তোমার বিবাহ—প্রেম।

কী চাও তবে? গড়বে অমরাবতী? আমি আছি—
অথবা ফেলবে আমাকে
সেই আত্মহত্যা আফিমের কারাগারে?
বেশ। থাকতেই হবে রাজি।
আমি যে বেশ্যা—ক্রীতদাসী তোমার
আমি—আমি স্পেন।

আগামী কাল তো ভবিষ্যত। তখন
অনুসন্ধান, প্রচেষ্টা, অনুশীলন;
তখন মগ্নচৈতন্য পরিবর্দ্ধিত
প্রাণায়াম ও আহারে।
আগামী কাল আবিষ্কার করবে আরো
কতো দুঃসাহসিক ও উচ্চকিত প্রেম;
ক্যামেরায় কালো কাকের ছবি—
স্বাধীনতার স্বকীয়তায়
আরো কতো সব রসিকতা;
শিল্পী, গায়ক, অভিনেতাদের আগামী কাল।

কিন্তু আজ শুধু সংগ্রাম
আজ বৃহৎ মৃত্যুর সুযোগ
প্রয়োজনীয় হত্যার সহজ স্বীকারোক্তি আজ।
তারপর ক্ষণিক সান্ত্বনা আজ : সন্তুষ্ট আধখানা সিগ্রেটে,
খামারে মোমবাতি জেলে
দু পিট্‌ তাস
মরদানা তামাসা, খিস্তি,
কর্কশ গান আর ঢলাঢলি।

তারারা মৃত। আর তাকাবে না পশুরা।
আমরা পড়ে আছি আমাদের দিনে, সময় সংক্ষেপ, সময় পরাজিতের।
ইতিহাস হয়তো বলবে 'আহা', কিন্তু অক্ষম সাহায্য,
আর মহাপাপ ক্ষমা।

গ্রামপ্রান্তের বন

স্বপ্রভা দত্ত

আমরা দেখিনু, পার হয়ে এল পাহাড়তলির পথ
বিজলীর মত পার হ'য়ে এল নির্ঝরিণী
অশ্বের খুরে ধূলি উড়ে উড়ে অকালে সন্ধ্যা হোল
দুর্দ্দম বেগে এলো সে অশ্বারোহী।

হাতে তরোয়াল, শ্রমে লাল মুখ, ধূলায় মলিন দেহ
আমরা সভয়ে পথ ছেড়ে দিনু, ভাবিনু রাজার দূত ;
কেহ বা বলিল, দিগ্বিজয়ী সে বীর
নাম শুধাইতে সাহস করি নি কেহ।

শুধু একজন, ছোট্ট মেয়ে সে চম্পাবতী
খেলাঘর হ'তে ছুটে গেল পিছে, হাত ধ'রে তার শুধালো,"কোথায়যাও?"
ইঙ্গিতে বীর দেখালো সুদূর গ্রামপ্রান্তের বন।

হাতে ঝলমল্ মুক্ত কৃপাণ, বিদ্যুৎ চোখে তার
অশ্বের খুরে দিগন্ত লাল হ'লো ;
আমরা সভয়ে চোখ বুজে শুধু জপিনু ইষ্টনাম
সূর্য্য হেলিল গ্রামপ্রান্তের বনে।

২

দক্ষিণ বায় বকুল ঝরায়, জ্যোছনা রাত
আমরা সকলে বাহিরে জুটি,
সহসা শুনিনু, যে সুর কখনো শুনি নি আগে
যে সুরে অকালে সাগরের জলে জোয়ার জাগে।

হাতে তার বাঁশী, গলায় জড়ানো পদ্মবীজের মালা,
জ্যোছনার মত মাধুরী সর্ব্বদেহে
নয়নে স্বপ্ন, গান গেয়ে গেল সরণি বাহি'
আমরা অবাক রহিনু চাহি'।

বাঁশরীর তানে মার কোল হ'তে ঘুম ভেঙে এল ছোট্ট মেয়ে,
'কোথা যাও', তারে শুধাল চম্পাবতী,
ইঙ্গিতে শুধু দেখাল সে দূর গ্রামপ্রান্তের বন।

জ্যোছনায় জলে অগাধ আকাশ, রাত হয়ে আসে ভোর,
স্বপ্নের মতো দিগন্তে মিলালো সে।
তবুও আমরা সভয়ে কেবল জপিনু ইষ্টনাম,
চন্দ্র হেলিল গ্রামপ্রান্তের বনে।

রোমন্থন

সমর সেন

"This miscrable mode the dreary souls of those sustain, who lived without blame, and without praise.

(১)

অনেকের সামনে অনেক বসন্ত,
শেষ কি আমাদের দিন,
কেন কানা গরু, মরা মাঠ, শূন্য গোলাঘর,
কেন শেষ আমাদের দিন?

অনেক আজগুবী কথা কৈশোরে শুনেছি ;
নিরালা কোনো কেন্দ্রে
স্বচ্ছন্দে যুগল জীবনযাত্রা,
আদর্শ বলে মেনেছি ,
জেনেছি জনগণ বর্বর
আত্মচিন্তাই পরম চর্চা।

বয়ঃসন্ধির সময়
মহাত্মাজীর আন্দোলন সুরু হল।
লবণ আইন ভাঙে, দলে দলে জেলে যায়,
মাঝে মাঝে বিপ্লবী বোমা ফাটে,—
হাতে হাতকড়া, নানাবিধ রদ্দা, চরম শাস্তি।
বন্ধ সংবাদপত্র, রাস্তায় নিষিদ্ধ পোস্টার :
জর্মানরা বুঝি বা বঙ্গোপসাগরে এলো।

লালপাগড়ীর লাঠির সামনে
(বঙ্কিমী সে লাঠি)
দেশবন্ধু পার্কে এলোমেলো পলায়ন,
আজো মনে পড়ে।
তখন কারো কারো মুখে শুনেছি
গণআন্দোলনের তত্ত্বকথা,
শুনেছি, মহাত্মাজীর অহিংসা পণ্ডশ্রম,
ভণ্ডামী মাত্র।
অকেজো আত্মম্ভরিতায় সহসা ভেবেছি,
আর যাই হই,
নির্বীর্য অহিংস ক্লীব নই।

বাংলার বাইরে, কঠিন মাঠে,
একদিন শুনেছি চাষীর গান :
মালগুজারী কৈসে লেওগে,
ঝাণ্ডা মেরি জিন্দাবাদ।

তারপর কলেজে প্রবেশ, প্রথম যৌবন ;
শ্রেষ্ঠ দিনগুলি একে একে গেল,
ইতিমধ্যে ইতস্তত, অনেকের মতো
মদনরাজত্ব থেকে বার কয়েক বিতাড়িত।
ওদিকে হাওয়ায় বর্ধমান শব্দ :
কারখানায় ধর্মঘট,
গ্রামে খাজনা বন্ধ করো,
জমিদার, বণিক বরবাদ,
ইনকিলাব, জিন্দাবাদ,
অর্থাৎ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক্।

কলরোল
সামনে বরাবর কালের জোয়ার,
সাঁতারের শক্তি কি সাহস কিন্তু কখনো ধরি নি।
অবশেষে আজ
অসংখ্য নিরক্ষর দুঃস্থের দেশে
নিঃসম্বল পর্যটক মাত্র,
বিশাল ভারত,
জন্ম আর জরা ; জীর্ণ জাল,
জন্ম আর জরা,
প্রতিষ্ঠিত বৃন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন
লক্ষ্যহীন কতো লোক,
মগজ স্মৃতিম্র জাবরে ভরা, চা আর ধূমপান,
নিষিদ্ধ গান।

(২)

শূন্য মাঠে স্তব্ধ দিন।
যতোদূর চোখ যায়, লৌহরেখা প্রসারিত
নির্বিকার অদৃষ্টরেখায়।

অন্নজলহীন মৃত্যু হয়ত,
ভবিষ্যতে হয়ত দুর্ভিক্ষ, চকিত প্লাবন ;
তবু দেখি ঝুরি ঝুরি শাকশব্জী, সহজ সবুজ,
সপ্তাহে দুদিন গ্রাম্য হাট বসে,
বেচাকেনা সাঙ্গ হলে
হুঁকো কলকে ঘন ঘন হাত বদলায়,
মহাজন চিন্তাহরা গন্ধ ছড়ায়।

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
অবোধ মন, বোঝানো ব্যর্থ।
পুত্রকন্যা এখনো আঙুলে গোণা যায়,
বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ,
তবু নিজেকে কতোদিনের জীর্ণ বৃদ্ধ লাগে,
জিভে স্বাদ নেই, জানি না
কী পাপে সুস্থ শরীর ঘুণের আশ্রয়।
আমার অজ্ঞাতসারে
পুরাতন প্রগল্‌ভ দিনরাত্রি আসা যাওয়া করে,
নদীর জোয়ারে, অন্ধকারে তিলে তিলে পৃথিবী মরে,
বুঝি পিঙ্গল বালুচর সর্বভুক, অবিনশ্বর।

তাই দিনান্তে কলের বাঁশীতে
মনে হয় পৃথিবীর শেষপ্রান্তে
করাল শূন্যের বৃত্তে
নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে ;
লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ,
শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ।

আজ আর কাল

বিভূতি চৌধুরী

মাঝখানে ছিলে তুমি : একধারে রেল-ইষ্টিশন,
ময়ূরাক্ষী নদীখানি আর পাশে—কিছুদূরে হোগলার বন,
হলদে রোদেরা কত ঝরিয়াছে ক্ষেতের উপর,
ধারালো দুপুরে মোরা দেখিয়াছি চিলের সফর।
গাঙচিল শঙ্খচিল ধূসর ঈগল
উড়িয়া গিয়াছে কত—চড়ুই পাখীর চোখে জল
ঝরেছে ওদের চেয়ে ; আমরা রয়েছি পাশাপাশি,
ফলন্ত ধানের শীষে বুলায়েছি হাত ভালবাসি।
ফড়িং-শিশুর খেলা দেখিয়াছি হেমন্তের ঘাসে,
দুপুরের স্বপ্নখানি মাছরাঙা পাখীটির দুই চোখে ভাসে,
কুঁজো বক ঘাড় গুঁজি চেয়ে আছে জলের ভিতর,
মাছের ঝাঁকেরা যেথা বাঁধিয়াছে ঘর।
সকাল দুপুর কত কাটায়েছি—সব মনে পড়ে,
হাওয়ার প্রলাপ কত শুনিয়াছি জানালার আমলকী গাছের উপরে,
মোদের ছাদের 'পরে বিকেলের পীতাভ আলোরা
বলিয়াছে কত—'যাই, যাই,'
তোমার কি কিছু মনে নাই—
বনছায়া, বন্ধু আমার ?

তোমার চুলের মতো অজস্র আঁধার কত পৃথিবীতে আঁসিয়াছে নামি,
পূবেতে উঠিয়া তারা পশ্চিম দিগন্তে গেছে থামি।
আকাশের সমুদ্র উপর
ভেঙে ভেঙে পড়িয়াছে কত রাতে শকুনের স্বর।
মাঝখানে ছিলে তুমি : পূবদিকে রেল-ইষ্টিশন,
আঁকা বাঁকা নদীখানি ছুটে চলে পাশে তার হোগলার বন,
রেলের রাস্তাখানি কোন দূরে মিশে গেছে কত দেশ ঘুরে,
এঞ্জিনের হুইসল্ মাঝরাতে বাজিয়াছে দূর হ'তে দূরে।
সেই সুরে অন্ধকার ফেটে গেছে—কাঁপিয়াছে 'নেবুলা'র মত,
নিঃশব্দে বসিয়া আছি, আমাদেরো মন যেন হয়েছে আহত।
ট্রেনের চাকার শব্দ
বৈশাখী ঝড়ের মতো দু'জনার মনটিরে উড়ায়ে নিয়েছে কোথা টানি।
আঁধারের সিঁড়ি ভাঙি স্বপ্নের পরীরা আসি খুলেছে দুয়ার—
মনে কিছু পড়ে নাকি তা'র—
বনছায়া, বন্ধু আমার ?

হুইসল্ থেমে গেছে তারপর কিছুক্ষণ হাওয়ার কাঁপন,
অশরীরী ছায়াদের খেলায় মাতিয়া গেছে হোগলার বন।
আর বার বেজে ওঠে ময়ূরাক্ষী নদী তীরে জাহাজের বাঁশী,
দুজনে নাবিক মোরা—চলিয়া গিয়াছি যেন সমুদ্রের লোনা জলে ভাসি।
তিমি তিমিঙ্গিল কত দেখিয়াছি পথে,
দারুচিনি গন্ধ আসে লবঙ্গ লতার দেশ হ'তে।
তোমার অজস্র চুল কাঁপিয়া উঠেছে থরথরি,
চম্পানদীর স্বপ্নে দুজনার চোখ গেছে ভরি।

কোন রূপকথা দেশে পাতাল-বাসিনী কন্যা আছে
সেই কথা নাহি জানি—তুমি শুধু ছিলে মোর কাছে।
অন্ধ হয়ে গেছি আমি, কানে বাজে জাহাজের বাঁশী,
দু জনে নাবিক মোরা—চলেছি চম্পার দ্বীপে ভাসি।

তারপরে রাত যায়—ভোর হয়, সোনালী সকাল,
এ মনের এই পিঠে আছে 'আজ'—অই পিঠে 'কাল';
স্মৃতির পাহাড় আছে—চলি তা'র আঁকা বাঁকা পথে,
জাহাজের বাঁশী আর এঞ্জিনের হুইসল্ বেজে ওঠে মনের জগতে।
কেটে গেছে বহুদিন—এক-দুই-তিন-চার—অনেক বছর,
আকাশে আজিও দেখি চিলের সফর।
আঁধারে চুলের গন্ধ আজও আমি পাই—
সেদিনের লক্ষ কথা কিছু মনে নাই,
বনছায়া, বন্ধু আমার ?

বাঙালি বুদ্ধিজীবী, ১৯৪০

বুদ্ধদেব বসু

(১)

যুক্তি গাঁথি, তর্ক ফাঁদি ; শ্রেষ্ঠ মানি মানুষী মনীষা,
অনাক্রমণীয় আস্থা নিরপেক্ষ, বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে ;
আমরা ভালোমানুষ, কারো পাকা ধানে মই দিতে
ইচ্ছা নেই ; সত্যানুসন্ধিৎসা নেশা, তাই এ বচসা।
অর্থাৎ সম্প্রতি বাদ-বিসম্বাদে হারায়েছি দিশা।
দলে নেই, ছলে নেই ; রিক্‌শাওলা, কুলি না হ'য়ে যে
অধ্যাপক হয়েছি, এ-সৌভাগ্য যথেষ্ট ঘ'ষে মেজে
স্বদেশ, সমাজ আর স্ত্রী-পুত্রের সেবাই উচ্চাশা।

বেশ তো ! চাষীর দুঃখ দূর করো, নাও তাড়ি কেড়ে
মজুরের ! তা ব'লে কি ষণ্ডামির প্রশ্রয়—আরে ছি !
ও-সব তো প্রোপাগাণ্ডা ! তাই মানো ? কী ছেলেমানুষি !
সার সত্য শোনো, মাথা ঠাণ্ডা করো ; হৈ-চৈ ছেড়ে
ভাবো তো, মুখে যা বলো, সত্যি তা-ই হয় যদি—তবে
সব যাবে, সব যাবে, একেবারে সর্বনাশ হবে।

(২)

ভয় ? না, কিসের ভয় ? বিভিন্ন বিরোধী তথ্য ঘেঁটে
সত্য খুঁটে বার করি বুদ্ধির ধারালো চঞ্চু দিয়ে—
বিজ্ঞাপনে ভুলি না, স্বাধীন চিন্তা করি। ভীরুতা এ ?

নির্ভয়ে বিশ্বাস করি মানুষ বাঁচে না শুধু পেটে,
মতের মুক্তিও চাই (নয়তো তর্ক জমবে কী নিয়ে ?)
শিল্প, ধর্ম, বিজ্ঞান, বাণিজ্য মানি। ভীরুতা এ ?

তবে যদি সুবুদ্ধিরে ভীরুতার আখ্যা দাও, বেশ—
দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা, অত্যাচার, এই যদি ভালো
মনে করো, রক্তমেঘে সভ্যতার শুভ্র শুভ আলো

নেবাতে চাও, তাহ'লে—শাস্তি তার পাবে হাতে-হাতে
নিশ্চয়। দুঃখিত ভাই, কিন্তু অন্য উপায়ও তো নেই!
সভ্যতার দায় বড়ো দায়। …আমি বলি, কেন এই
হৈ-চৈ ? যা আছে থাক না তা-ই। অন্যায় ?…আছেই।
উন্নতির চেষ্টা করো, হয়তো শিকে ছিঁড়বে বরাতে।

As for me,
I had overprepared the event—
Ezra Pound.

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ফ্ল্যাটের সিঁড়িতে সন্তর্পণ কান পাতা।

ঘর গুছিয়েছিলুম, বেশী যত্ন নিয়েই যেন
যেন মাঝ বয়সের উৎকণ্ঠিত হাতে।
টেবিলে বাছাই করা বই,
সযত্নে পাতা খোলা
—আজু মজু শুভদিন ভেলা।

পাঁচটা বাজল, সাড়ে পাঁচটা।
জানলায় চেয়ে থাকি।
গুঁড়ো বৃষ্টি আর এলোমেলো ট্রাম।
আর মাঝ বয়সী সন্তর্পণে গোছানু ঘরে
দেয়ালের ক্যালেণ্ডারে
হাওয়ার ফাঁপা শব্দ।
এলোমেলো ট্রাম আর আজু মজু……

ভাবি, হঠাৎ সিঁড়িতে শুনব
লঘু পায়ের শব্দ
—লঘু আর নরম—
ফিকে সবুজ জলে সোনালী মাছের মত।

এমন সময় চিঠি এল
—চললুম 'উটি'তে
'ব্রুক্‌স বেন্‌ড্‌,' চিঠি দিও—

মনে হল গুমোট করেছে অসহ্য ;
আর বিগত একুশ বছরের মুহূর্তেরা
অদ্ভুত মুখোশ পরে ভিড় করছে যেন।

বৈকালী

বিষ্ণু দে

মর্মর-নিথর
নিস্রোত ঢাকুরিয়ার দীঘি
ঘাসে ছাওয়া পাড় শুধু আগ্নেয়গিরির
গলিত উপত্যকায় তেরো নদীর পারে শূন্য শুক্‌নো তেপান্তর।
ক্ষমা নেই আর।
অবিশ্রাম ঘোরে
মোটা সোটা ধামা চাপা গাড়ী ঢাউস্ নতুন
এমেরিকার ইটালির কারবার
এক আধটা বেহুঁষ টুরার
সাইকেল বা ফীটন্
বাদাম আর হ্যাপি বয়
এসকিমো পাই সাইকেল চড়ে'।
কদাচিৎ যদি হাওয়া দেয়
ম্যাকাডামে যদি ধূলো ওড়ে।
বেজায় গরম
হগমার্কেটে ভিড় কম
কৃষ্ণচূড়ার নিষিদ্ধ বিলাসে,
গুল্‌মোরের বিবর্ণ সোনায়
শোনা যায় নাভিশ্বাস
দিকে দিকে চৌরিঙ্গীর উদ্বায়ু ট্র্যাফিকে।
পড়ন্ত বাজার।
পড়ন্ত রোদ্দুরে চিক্‌চিকে
ঘোলাটে নদীর জল
সাইরেনের ডাক ছাড়ে নাকো

ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই যেখানেই থাকো
সিনেমার নরম শীতেই
যদি বসে' বাঁচি
নিনোচ্‌কার হাসি দেখি, হাসি
আর শেষে হাঁচি।
ক্ষমা নেই মৃত্যুঞ্জয় কঠিন সময়
ক্ষমা নেই তার।
গ্রাম তো হাপর
হাঁপ ধরে সেই মরা ঝরে' পড়া বাগানে ভাগাড়ে ঝোপে ঝাড়ে
চিম্‌নির ধোঁয়ায়
শ্যাওলায় আগাছায় নোংরায় ভাঙা পথে
মড়াখেকো কুকুরের বিবর্ণ রোঁয়ায়
জীর্ণ মঠ বিদীর্ণ মন্দিরে
ঝিরঝিরে মরা নদী, মজা খাল, শুকনো পুকুরে
দুই হাটে মারামারি, মেলা নিয়ে বোর্ডের ব্যবসায়
টিউবওয়েল কেই বা বসায়।
প্রকৃতির কোলে আর শান্তি নেই, পাটকলে যায়!
দূর থেকে নম নম হে সুন্দরী হে মম জননী বঙ্গভূমি!
এ গরমে ক্ষমা নেই, মৃত্যুঞ্জয় কঠিন সময়
ক্ষমা নেই তার, ইতিহাসে, বিরাট প্রাসাদে
মহলে মহলে ঘোরে সময়ের ক্ষিপ্র গুপ্তচর
অবারিতগতি, চুপিসাড়ে সুয়োরাণী ভাবে
বুঝি তারই ঘরে মেটে মিতালির সখ, অন্তরঙ্গ
সে রাজদূতের, সাতমহলের সেরা সদ্য ফুল
অষ্টাদশী সুয়োরাণী ভাবে, কোটালের দূত তবু
আপন ধান্দায় চলে স্বার্থহীন একাগ্র সন্ধানে।

অম্লান সে ব্যাজহাস্যে মর্মভেদী আসন্ন আঘাতে
ক্ষমা নেই। অনাগত সসাগরা ধরিত্রীর এক-
ছত্র দণ্ডধরও সময়ের হাতে। জানি জানি তাই
শান্তি নেই ঘর্মাক্ত গুমোটে, সদাগর কোটালেরা
ঘোরে শ্রান্তিহীন স্বার্থের ব্যসনে মরীয়া প্রহরে
আপন মৃত্যুর পথে বৃদ্ধ বন্য পশুর মতন।
শূন্যমনে ফিরে যাই ঘরে, উল্টাডিঙির প্রান্তে
মেসের খোপের টানে দিশাহারা কলের সরকার॥

নতুন কবিতা

নবজাতক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, দেড় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের এই নতুন কাব্যগ্রন্থের নামকরণ ইঙ্গিতময়। সম্প্রতি তাঁর কাব্যে মৃত্যু অনেকখানি প্রাধান্য জুড়েছিলো, এখানে মৃত্যু গেছে দূরে। 'প্রান্তিকে' দেখেছি কবিকে অন্ধকারের ভীষণ শক্তির সঙ্গে যুঝতে, এবারে হার হয়েছে অন্ধকারের, নতুন সূর্যোদয় দিগন্তে। তাঁরই অনুপম ভাষা চুরি ক'রে বলতে হয় যে তিনি চিরজীবিত, তাই তিনি বার-বার নবজাতক।

'নবজাতকে'র কবিতাগুলির দুটি বিশেষত্ব। প্রথমত, এরা স্বল্পভাষী। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে।' এ-স্বল্পভাষিতার আরম্ভ 'পরিশেষে'; অলঙ্কার পরিহার ক'রে, কথিত ভাষার সঙ্গে যথাসম্ভব সঙ্গতি রেখে আখ্যানের সঙ্গে মননকে একটি অপূর্ব মাত্রায় মিশিয়ে যে-সব কবিতা সে-সময়ে তিনি লিখেছিলেন তা তক্ষুনি পাঠকের চিত্ত হরণ করেনি, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই আমরা তাদের মূল্য বুঝতে পারছি। 'নবজাতকে'ও এমন কোনো আপাত-চমৎকারিত্ব নেই যার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়া মাত্র পাঠক মুগ্ধ হবে; বরং, যে-যে কৌশলে পাঠকের অন্যমনস্কতাকে সঙ্গে-সঙ্গে জয় করা যায়, সেগুলো সযত্নে পরিত্যক্ত হয়েছে। গভীর অভিনিবেশের সহিত বহুবার আত্মপ্রয়োগ করলে তবে পাঠক পারবেন এর সুরের সঙ্গে সুর মেলাতে।

এ-কবিতাগুলির দ্বিতীয় বিশেষত্ব তাদের বিষয়বস্তুর। কতগুলি 'আধুনিক' বিষয়, যথা—রেলগাড়ি, এরোপ্লেন, রেডিও যে এ-বইয়ে স্থান পেয়েছে তা উপর-উপর নজরেও ধরা পড়বে। কিন্তু যদি এটুকুই শুধু হ'তো তাহ'লে ব্যাপারটা উল্লেখযোগ্যই হ'তো না। আসল কথা এই যে কবিতাগুলি সবই বিশ শতকের যন্ত্রসভ্যতাপীড়িত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। উপমার জন্যে কবি শুধু প্রকৃতিরই দ্বারস্থ হননি, আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অতি পরিচিত উপকরণেরও সাহায্য নিয়েছেন :

এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি,
দিল পাড়ি,
কামরায় গাড়িভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

মানব জীবনের প্রতীক হিসেবে এখানে দেখছি খেয়ার বদলে রেলগাড়ি—

সকাল বিকাল ইস্টেশনে আসি,
চেয়ে চেয়ে দেখতে ভালোবাসি।
ব্যস্ত হ'য়ে ওরা টিকিট কেনে,
ভাঁটির ট্রেনে কেউ বা চড়ে
কেউ বা উজান ট্রেনে।

কিন্তু আধুনিক জীবনের 'বাস্তব' দিক সম্বন্ধে এই সচেতনতার জন্ম গভীর বেদনায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্ম কিংবা creed আমরা সকলেই জানি, এ-গ্রন্থেও তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি যে তিনি 'রোম্যান্টিক'।

আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক।
সে-কথা মানিয়া লই
রসতীর্থ পথের পথিক।
মোর উত্তরীয়ে
রং লাগায়েছি, প্রিয়ে।...

যা কুৎসিত, যা তুচ্ছ, তাকে বেশি ক'রে দেখাকেই 'রিয়্যালিজ্‌ম্' বলে না, এ-কথা আমাদের মনে করিয়ে দিতে কবি অক্লান্ত। তবু, আধুনিক জগতের দিকে তাকিয়ে তাঁর অপরূপ প্রশান্তি আর তিনি বজায় রাখতে পারছেন না; যাঁর উত্তরীয় স্বভাবতই রঙিন, তিনি যে দোলের দিনে ভুল ক'রে কালো কাপড় প'রে-ছিলেন তার কি কোনো অর্থ নেই? সমস্ত পৃথিবীর মুখই যে আজ কালো কাপড়ে ঢাকা; এ-জগতে কোথায় কবির স্বাধীনতা, অব্যাহত শিল্পসৃষ্টির অবাধ আনন্দ? কোথায় রং? কোথায় গান? যেখানেই কবির চোখ পড়ে, সেখানেই স্বার্থে-স্বার্থে হানাহানি, বিদ্বেষের বিষ; মানুষমাত্রেই আজ একাধারে যমদূত ও যমের খাদ্য। কবির বাণীতে তাই আজ বিস্ফুরিত হচ্ছে তীব্র রোষ আর

ঘৃণা; কাউকে তিনি খাতির করেননি, বণিক ও ধর্মযাজকের মুখোস খ'সে পড়েছে, এমন কি বিজ্ঞানের প্রতি বার-বার পড়েছে তাঁর রোষদৃষ্টি। সভ্যতার এই বীভৎস মূর্তিকে কিছুতেই তিনি ভুলে থাকতে পারছেন না। রেডিওতে বিদেশিনীর অশরীরী কণ্ঠস্বর শুনতে-শুনতে তাঁর মনে হয়:

করিয়াছে ভেদ...
রণক্ষেত্রে নিদারুণ হানাহানি,
লক্ষ লক্ষ গৃহকোণে সংসারের তুচ্ছ কানাকানি
সমস্ত সংসর্গ তার
একান্ত করেছে পরিহার।

খুঁতখুঁতে লোক এ-কথা বলবে যে রেডিওর প্রতি কবির যে-অনুকম্পা, বিজ্ঞানের অন্যান্য কীর্তির প্রতি তা অনুপস্থিত। অর্থাৎ রেডিও যে প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় সমস্ত পৃথিবীতে হিংসার বীজ ছড়াচ্ছে তা তিনি ছাখেননি, রেডিও যে মনোহর সঙ্গীতের বাহন সেটাই শুধু লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু মানুষ যে পাতালে নেমেছে কি আকাশে উড়েছে তা থেকে জগৎবাসীর কত বড়ো ও কত বিচিত্র সুখের উদ্ভব হয়েছে ও আরো কত হ'তে পারে সে-কথাটা উপেক্ষা ক'রে কবি তার হত্যাকারী দিকটাই শুধু দেখেছেন:

হায় ধরিত্রী, তোমার আঁধার পাতাল দেশে
অন্ধ রিপু লুকিয়ে ছিল ছদ্মবেশে
সোনার পুঞ্জ যেথায় রাখো
আঁচল তলে যেথায় ঢাকো
কঠিন লৌহ, মৃত্যুদূতের চরণ-ধূলির
পিণ্ড তারা, খেলা জোগায়
যমালয়ের ডাণ্ডাগুলির।

'পক্ষী মানব' সম্বন্ধে তিনি বলছেন:

যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে
অশান্তি আজ উদ্যত বাজ
কোথাও না বাধা মানে;

ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা।

আধুনিক সভ্যতার একটা ব্যাপক বর্ণনা আছে 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতায়:

ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।...
ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা,
রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর
একদিন হবে ঢিলা।

কিন্তু পৃথিবীর এই দারুণ দুর্দিনের জন্য দায়ী কি বিজ্ঞান, না মানুষের লোভ ও মূঢ়তা? বিজ্ঞানকে মানুষ যদি অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে, সে-দোষ কি বিজ্ঞানের? যদি কোনোদিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সুখী হয়, স্থায়ী হয় শান্তি, সে কি হবে না বিজ্ঞানেরই সাহায্যে, যে-বিজ্ঞান মানুষের শুভবুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত, ভ্রাতৃত্ববোধে পরিচালিত?

মানি, কাব্যসমালোচনায় এ-সব প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু এ-সব প্রশ্ন এড়িয়ে কাব্য যে আর চলতে পারছে না, এই 'নবজাতক' গ্রন্থই তার একটি প্রমাণ।

মৈনাক, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কবিতা ভবন, এক টাকা।

কামাক্ষীপ্রসাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শবরী'র সঙ্গে 'মৈনাকে'র সময়ের ব্যবধান যতখানি, পরিণতির স্তরভেদ সে-তুলনায় ঢের বেশি। ইতিমধ্যে কামাক্ষীপ্রসাদের বহু কবিতা বহু সাময়িক পত্রে বেরিয়েছে, এবং কবি হিসেবে তিনি রীতিমতো প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। 'মৈনাক' বইটির স্বল্পসংখ্যক কবিতাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই তাঁর খ্যাতিকে আরো ব্যাপক ও দৃঢ় করবে।

কবিদের গায়ে লেবেল আঁটার মতো ভ্রান্তি বোধ হয় আর-কিছুই নয়, তবু 'মৈনাক' বইটি প'ড়ে এ-কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কামাক্ষীপ্রসাদের মনের আবহাওয়া রোম্যান্টিক। অর্থাৎ সে-আকাশ নির্লিপ্ত নীল নয়, সেখানে রঙিন

মেঘ জমে, ঝড় ওঠে, আলোর সঙ্গে ধুলোর লুকোচুরি খেলা চলে, কখনো বা বৃষ্টি-ধোয়া আকাশের ফাঁকে-ফাঁকে শান্ত নীল উঁকি দেয়। উপমা ছেড়ে দিলে বলতে হয় তাঁর নিজের মনের বিবিধ খেয়ালই তাঁর কাব্যের বিষয়। কবির ব্যক্তিগত বিষাদ ও ব্যঙ্গ, হর্ষ ও হতাশার আলো-ছায়া এ-বইটির টানা-পোড়েন।

এখন, অনেকে আছেন যাঁরা 'ব্যক্তিগত' হওয়াটা অপরাধ মনে করেন, আমি করিনে। তার কারণও ব্যক্তিগত, তাহ'লে আমাকেই সকলের আগে কাঠ-গড়ায় দাঁড়াতে হয়। তবে যদি বলা হয় আজকালকার দিনে ব্যক্তিগত হওয়াটা ডেকাডেন্সের লক্ষণ, সেটা মেনে নিতে আত্ম-শ্লাঘায় বাধে না, কারণ ডেকাডেন্স একটা ঐতিহাসিক লক্ষণ, তার সঙ্গে কাব্যের উৎকর্ষের সম্পর্ক নেই। বরং ডেকাডেন্ট যাঁকে বলি তাঁর উৎকর্ষ স্বতঃই মেনে নিই, কারণ যে-রচনা শিল্পের বিচারেই ব্যর্থ তাকে অত বড়ো একটা অপবাদ দিয়ে কেউ সম্মানিত করবে না।

'মৈনাকে'র কবিতাগুলির মধ্যে কামাক্ষীপ্রসাদের স্বাভাবিক বৃত্তির সঙ্গে দু' একজন আধুনিক কবির প্রভাবের একটি সংগ্রাম লক্ষ্য করলুম।

স্মৃতির দুয়ারে শঙ্কিত করাঘাত
বন্যার মাঝে ছোটো ছোটো দ্বীপ যেন,
কথা কও তুমি, কথা কও তুমি, প্রিয়,
আলোতে ছায়াতে দুরন্ত সন্ধ্যায়।

('কথা কও তুমি')

কবে
চৈত্র-তপ্ত দীপ্ত নারী এক
তুষারের বর্ম ছিঁড়ে দৃপ্ত দৃঢ়তায়
দেখা দেবে
কবে

('স্তব্ধ রাতে')

হেমন্তের নিভৃত বিকেলে
ধানকাটা মাঠ
চকিত হঠাৎ
চোখে পড়েছিল।

কর্কশ খড়ের খুঁটি রুগ্ন মাঠে শুধু ফুটেছিল।
আমার এক একটি দিন আর সব রাত
হেমন্তের বিকেলের ধানকাটা মাঠ।

('ধানকাটা মাঠ')

এ-সব পংক্তির স্বচ্ছন্দ গতি ও অনুভূতির আন্তরিকতার সঙ্গে নিচের উদ্ধৃতির তুলনা হয় না, হয় প্রতিতুলনা :

যে জীবন গাঁথা বহু মৃত্যুর ভিতে
বিস্মৃতি পাবে ঈশ্বর অহিফেনে?
অস্থির নীচে অস্থির নীচতায়
অগ্রগতিকে পারবে তো নিতে চিনে?

('পাশা')

কি হবে মাধবী-উপবন-ছায়া দিয়ে
মরণের হ্রেষা চারিপাশে শোনো নি কি?
কি হবে কোমল কটির স্বপ্ন দিয়ে
সন্ধ্যা যেখানে বন্ধ্যা ও একাকিনী।

('সময়')

কিন্তু সুখের বিষয়, উল্লিখিত দুটি দৃষ্টান্ত ছাড়া এ-ধরণের স্খলন ও-বইয়ে আর বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু স্বধর্মের সঙ্গে সময়ধর্মের এই বিরোধ কবিকে কাটিয়ে উঠতে হবে, এবং সেটা হবে একটির অঙ্গীকারে ও অন্যটির বর্জনে নয়, দুয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য সৃজনে। সেটাই হবে কবির বৈশিষ্ট্য, যা অন্যান্য কবি থেকে স্বতঃই তাঁকে চিনিয়ে দেবে। কেননা সময়ধর্ম এক হ'লেও বিভিন্ন কবির উপর তার প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন, এবং সেই বিভিন্নতাতেই কবিত্ব-শক্তির স্বাক্ষর।

এ-সম্বন্ধে কামাক্ষীপ্রসাদ যে সচেতন তারও পরিচয় এ-গ্রন্থে পেলুম। বাঞ্ছিত ভারসাম্য যে কখনো-কখনো তিনি নিজের মধ্যে পেয়েছেন তার প্রমাণ আছে কয়েকটি কবিতায়।

আবার বসন্ত এলো
ফাল্গুনের নিভৃত রাত্রিরা সমুজ্জ্বল তোমার শিখায়

বনের ধনুক থেকে
তীক্ষ্ণ তীরের মত
হরিণের দল
মিলে যায় দিগন্ত-সীমায়।

('চাঁদ')

উপমাটি উল্লেখযোগ্য, এবং সমস্ত কবিতাটিই আমার খুব ভালো লাগলো। কামাক্ষীপ্রসাদ যে যথার্থভাবে তাঁর শক্তির সন্ধান পেয়েছেন তার আরো প্রমাণ আছে :

মৈনাক সৈনিক হও
ওঠো কথা কও।
দূর কর মন্থর মন্থরা
মেদময় স্ফীত বৃদ্ধ জরা।
রক্তে জাগে পুরোনো সূর্য্যের ইতিহাস
সে কি পরিহাস?
এ সুদীর্ঘ দিনরাত্রি প্রেতপদক্ষেপে
স্মৃতিরে করেছে পিরামিড,
আর সব উর্ম্মিময় আরক্ত প্রহর
মিশরের মমি হায়
শিশিরে ধূসর।

('মৈনাক, সৈনিক হও')

বস্তুত, 'মৈনাকে' সার্থক রচনার সংখ্যাই বেশি, এবং সমস্ত বইটি প'ড়ে সন্দেহমাত্র থাকে না যে কামাক্ষীপ্রসাদ অচিরে আরো বেশি উৎকর্ষের অধিকারী হবেন। দুটি মাত্র ক্ষুদ্র আপত্তি আমার আছে: প্রথমত, সুলভ অনুপ্রাসের মোহ এখনো তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, আর তাছাড়া 'দিনেরা' 'সূর্যেরা' 'ছায়ারা' প্রভৃতি বহুবচন কখনো-কখনো চমৎকার শোনায় সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের পুনরুক্তি বিরক্তিকর ও মুদ্রাদোষ-ঘেঁষা। এ-ত্রুটির সংশোধনও সহজ, কারণ বাংলায় একবাচক শব্দ প্রায়ই বহুবচনের কাজ করে।

বুদ্ধদেব বসু

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্রনাথের জীবনে, সুতরাং সাহিত্যে, পদ্মা ও শান্তিনিকেতন দুটি প্রধান প্রভাব। তাঁর জীবনের এ দুটি পর্যায়ের স্বাদ ও সৌরভ স্বতন্ত্র, কিন্তু একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। খুব সাধারণভাবে বলা যায় যে পদ্মার নির্জনতায় কবি যে-ব্রত গ্রহণ করেন, শান্তিনিকেতনে তারই উদ্‌যাপন; পদ্মায় প্রস্তুতি, বীরভূমের প্রান্তরে নিজের পূর্ণতম বিকাশ। এ-কথা রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের পক্ষে যতটা খাটে, সাহিত্যজীবনের পক্ষেও ততটা। 'সোনার তরী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদ্মা-প্রসূত গ্রন্থ। এর পর থেকে জলের ও আকাশের নিত্য বৈচিত্র্য শুধু নয়, তীরবর্তী পল্লীজীবনের যবনিকাহীন রঙ্গমঞ্চ রবীন্দ্র-সাহিত্যকে কিছুকাল সম্পূর্ণ দখল ক'রে রেখেছিলো, এ-কথা আমরা সকলেই জানি। 'সোনার তরী'র পরবর্তী অনেকগুলি কবিতা, তাছাড়া 'ছিন্নপত্র' ও 'গল্পগুচ্ছ' এ-সবই একই প্রেরণা থেকে উৎসারিত। পদ্মার বুকে ও তীরে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতিকে একসঙ্গে পেয়েছিলেন; একদিকে নিশ্চিন্ত অবসরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসম্ভোগ ও অধ্যয়ন, অন্যদিকে জমিদারি পরিচালনা উপলক্ষ্যে প্রতিদিন মানবচরিত্রের ও বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ, সাহিত্য-প্রতিভার পক্ষে এ-বিদ্যালয় বড়োই চমৎকার। এ-সময়কার কবিতাগুলি যেন জলের স্বর আর মেঘের রং দিয়ে গড়া, তারা এতই খেয়ালি, এতই আত্মগত, জলের মতো তারা স্বাধীন, মেঘের মতো ক্ষণে-ক্ষণে তাদের রং বদলায়। রবীন্দ্রনাথ যে রোম্যান্টিক জাতের কবি, এ-কথা নতুন ক'রে বলবার নয়; এখানে আমার বলবার কথা এই যে যে-ভাবোন্মাদনা, বাণীর যে উচ্ছ্বসিত অনর্গলতা, ছন্দের যে-সব নটিনী-ভঙ্গিমা রোম্যান্টিসিজ্‌ম্‌-এর প্রধান লক্ষণ, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তার চরম স্ফূর্তি বোধ হয় 'সোনার তরী'তে ও 'চিত্রা'য়। কিন্তু এই কবিতাগুলির মেঘ-মায়ার

* তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী। এই খণ্ডে আছে; কবিতা—সোনার তরী; নাটক ও প্রহসন—চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ; গল্প ও উপন্যাস—চোখের বালি: প্রবন্ধ—আত্মশক্তি।

চেয়েও যা বিস্ময়কর তা এই যে এই অপরূপ স্বপ্নলোকেই তিনি বন্দী হয়ে থাকেন নি, বেরিয়ে এসেছিলেন আমাদের প্রতিদিনের সুখদুঃখের সাধারণ জগতে, এরই সঙ্গে-সঙ্গে ব'য়ে চলেছিলো তাঁর গল্পস্রোত, যার কবিত্বময় গদ্যে মরলোকেরই বিচিত্র লীলা। মনে করুন সমুদ্র ও পাহাড়ে ঘেরা ইটালীয় শহরে ব'সে শেলি তাঁর অপূর্ব গীতিকবিতাগুলো লিখছেন, আবার একই সময়ে তাঁর কলম থেকে বালজাকের গল্পরাজি বেরোচ্ছে। এমন আশ্চর্য সমন্বয় আর কবে কোথায় হয়েছে!

এ-বিষয়ে 'রচনাবলী'তে 'সোনার তরী'র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> মানসীর অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক সহরেরর বাংলা-ঘরে। ...সেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের যে বুনুনির কাজ করেছিলুম এর পূর্বে তা আর কখনো করি নি।...কিন্তু সোনার তরীর লেখা আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি,...পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলমেশা করেছিল মনের মধ্যে।...সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোট গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে-ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।

তাঁর এই সময়কার মানসজীবনও তিনি আমাদের জানিয়েছেন—

> এইখানে (পদ্মায়) নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে।... মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।...সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হ'ল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ ক'রে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।

বস্তুত, 'সোনার তরী'তে পাশাপাশি দুটি সুরই বেজেছে ও পরস্পরকে সম্পূর্ণ করেছে; যে-জাদু মেঘে-চাপা সূর্যালোকের মতো নানা রঙে কবিতাগুলোয় বিচ্ছুরিত, তারই ফাঁকে-ফাঁকে আর-একটি জগতের আমরা পরিচয় পাই যেখানে

একটি তিন বৎসরের কন্যার একটি অবোধ কথা সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে করুণ ক'রে তোলে। 'মানস সুন্দরী' আর 'যেতে নাহি দিব' পাশাপাশি পড়লেই এ-বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হবে। বিশেষণের পর বিশেষণে, উপমার পর উপমায়, প্রতিরূপের পর প্রতিরূপে, বর্ণনার গৌরবে ও আবেগের উত্তাপে 'মানস সুন্দরী' এমন দুর্বার গতিতে ব'য়ে চলেছে যে সেই অজস্র অপূর্ব উচ্ছ্বাসে আমরা বিহ্বল হ'য়ে পড়ি, শেষ পর্যন্ত মনে হয় এ কবিতা যেন নিজেই নিজেকে লিখেছে, কবি উপলক্ষ্য মাত্র, অর্থাৎ কবির প্রেরণা কবিকেই ব্যবহার করেছে যন্ত্র হিসেবে, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেনি। এ-কবিতা মরলোকের এতই উর্ধে যে এত ঐশ্বর্য নিয়েও শেষ পর্যন্ত একটু অতৃপ্তিবোধ রেখে যায়। কিন্তু 'যেতে নাহি দিব' এই পৃথিবীরই কবিতা। এর করুণ মধুর বিদায়দৃশ্যে আমরা সকলে সমান অংশীদার। এই চিরপরিচিত নাটিকার পঞ্চমাঙ্কে কবি যখন বললেন :

> তবুও সময় হল শেষ, তবু হায়
> যেতে দিতে হল।

তখনই সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের মন কবিতার বাকি অংশের সঙ্গে একসুরে বাঁধা হ'য়ে গেলো; নাটক শেষ হ'য়ে যাবার পরেও কবি তাঁর দীর্ঘ স্বগতোক্তির শেষ পর্যন্ত যে এমন অনায়াসে আমাদের নিয়ে গেলেন তার কারণ বাক্যের ইন্দ্রজাল নয়, যদিও বাক্যের ইন্দ্রজালও আছে; তার কারণ এমন একটি সর্বজনলভ্য অনুভূতি, যা বিশ্বপ্রকৃতিকে ক্ষণেকের জন্য হৃদয়গ্রাহ্য ও বাণীময় ক'রে তুলেছে। 'বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা' বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বোঝেন, এখানে তা অনুমান করা শক্ত হয় না।

'যেতে নাহি দিব'-র হেমন্তের দুপুরবেলাটির ছবি সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে একটি উজ্জ্বল স্থান অধিকার ক'রে আছে। এ-চিত্র যে এত স্পষ্ট তার কারণ এর পটভূমিতে আছে একটি ক্ষুদ্র মানবপরিবারের একটি করুণ মুহূর্ত। এ ছাড়াও, 'সোনার তরী' প্রধানত চিত্ররূপময় কাব্য। বাংলার নদীতীরের পল্লীপ্রকৃতি এখানে তার সরস মধুর শ্যামলতায় জীবন্ত।

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসী মাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা।

কিংবা

হেথা শ্যাম দূর্বাদল নবনীল নভস্তল
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে—

এ-সব উদাহরণ সকলেরই মনে পড়বে। 'সোনার তরী' কি 'হৃদয় যমুনা'র খ্যাতি লাভ না করলেও 'ভরা ভাদরে' কবিতাটির চিত্রগৌরব অসাধারণ, আমি এমনও বলবো রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ লিরিক জাতীয় রচনার মধ্যে এ-কবিতাটির উঁচু স্থান। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি তো অতুলনীয়—

ঝিলিমিলি করে পাতা ঝিকিমিকি আলো।
আমি ভাবিতেছি কার আঁখি দুটি কালো।
কদম্বগাছের সার
চিকন পল্লবে তার
গন্ধে ভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরালো।

'সোনার তরী' থেকে আমরা যতই অগ্রসর হই ততই দেখি এ-ধরণের সরল, অন্তরঙ্গ চিত্র বিরল হ'য়ে আসছে; এই নিবিড় প্রকৃতিসম্ভোগ, মানবহৃদয়ের সুখদুঃখ বিরহমিলনের আন্দোলন পার হ'য়েও রবীন্দ্র-প্রতিভা যে কোনো-এক 'অনির্ণীত, অনির্দেশ্য অলক্ষ্যের' দিকে ছুটেছিলো তার আভাস আছে 'সোনার তরী'র শেষ কবিতাতেই। এই পৃথিবীর, বিশেষত এই বাংলাদেশের, জাদুকর হৃদয় তাঁকে বরাবর তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু এ-ও ঠিক যে সে-আকর্ষণ কাটিয়ে কোনো এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে না-পড়লে তাঁর প্রতিভা সম্পূর্ণ

সার্থক হ'তো না। আসলে অবশ্য সে-যাত্রা নিরুদ্দেশ হয়নি, যাত্রার বেগই নিজের পথ ও গন্তব্য স্থির ক'রে নিয়েছিলো, অপরিচিতার সোনার তরী যে-পারে তাঁকে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলো তার নাম 'গীতাঞ্জলি, তার নাম 'বলাকা'। রবীন্দ্র-প্রতিভার দ্বিপ্রহরে মৃত্তিকা-উত্তর যে কাব্যজগত গ'ড়ে উঠেছিলো, যা ইওরোপে তাঁকে 'মিস্টিক' আখ্যা দিয়েছে, সে-জগত তিনি দখল করতে পেরেছিলেন তখনকার মতো পৃথিবীকে ত্যাগ ক'রেই। অবশ্য এ-কথা ব'লে সম্পূর্ণ কথাটা বলা হ'লো, না, কারণ মানুষের সংস্পর্শ, মানুষের পরিচয় তাঁর সাহিত্য থেকে কখনোই যে বেশি দূরে থাকতে পারেনি, তার প্রমাণ আছে 'কথা ও কাহিনী'তে আছে 'নৈবেদ্য' 'পলাতকা'য়, এমনকি 'গীতাঞ্জলি'তেও আছে—গল্প-উপন্যাসগুলির কথা ছেড়েই দিলুম। এখানে আমার বলবার কথা এইটুকু যে বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে মানুষ হ'য়ে বাঁচবার যে-সহজ, জৈব আনন্দ, যে-আনন্দ থেকে 'সোনার তরী'র এই চিত্রগুলি উৎসারিত, 'খেয়া'র পর থেকে সে-আনন্দ গভীরতর ও ব্যাপকতর একটি অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে। এ-ধরণের অন্তরঙ্গ চিত্র তখন থেকেই আবার আমরা পেতে লাগলাম, যখন কবি গদ্য-কবিতা লেখা ধরলেন, যদিও 'লিপিকা' 'পুনশ্চ'র ছবিগুলির মূল জৈব জীবনানন্দ নয়, অনাসক্ত জীবন-দর্শন।

আঙ্গিকের দিক থেকে 'সোনার তরী'র প্রধান উল্লেখযোগ্য জিনিস বিজোড়-মাত্রার ছন্দে কবির আধিপত্য বিস্তার। চোদ্দ মাত্রার এক মাত্রা উড়িয়ে দিয়ে কবি 'সোনার তরী' কবিতার ছন্দ সৃষ্টি করলেন, চোদ্দ মাত্রার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বদলে দিয়ে 'তোমরা ও আমরা' কবিতায় নতুন এক ছন্দ উদ্ভাবন করলেন, এ-কথা আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু এ-সব ছন্দকে পয়ার জাতীয় মনে করলে আমরা মস্ত ভুল করবো। এ-সব ছন্দ অক্ষরবৃত্ত নয়, মাত্রাবৃত্ত, অর্থাৎ এদের অক্ষর গণনায় যুক্তাক্ষরকে দু'মাত্রা ধরতে হয়, যা পয়ারে হয় না। পয়ারের স্বাভাবিক যতিপাত চার, ছ' কি আট মাত্রায়; তিন, পাঁচ কি সাত মাত্রা পয়ারে বসাতে হ'লে অসাধারণ নৈপুণ্য লাগে, কিন্তু তিন, পাঁচ, সাতই এ-সব ছন্দের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস; এবং এই বিজোড় মাত্রাগুলিকে যে কত বিচিত্র ও

সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু 'মানসী'তে এবং আরো বেশি 'সোনার তরী'তে রবীন্দ্রনাথ তা নিঃশেষে দেখিয়েছেন। বিজোড়মাত্রায় নির্ভর ক'রে এক চোদ্দ মাত্রারই কত রকম বৈচিত্র্য হয়, তা এ-কবিতাগুলি থেকে আবিষ্কার ক'রে অবাক হ'য়ে যেতে হয়

(১) ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী
৩ ৪ ৪ ৩

(২) পুরোনো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে
৩ ৪ ৩ ৪

('মানসী')

যতিপাতের সামান্য একটু পরিবর্তন ও হসন্তের বদলে স্বরান্ত শব্দের প্রাধান্য, শুধু এইটুকুর ফলে দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হ'য়ে উঠেছে। প্রথমটি মন্থর, এমনকি একঘেয়ে, দ্বিতীয়টি চঞ্চল, আর তারপর দ্বিতীয়টির মাঝের মিলটা বাদ দেয়ায় তার লয় রীতিমতো দ্রুত হ'য়ে উঠলো—

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে

('সোনার তরী')

এগুলোর সঙ্গে নিচের উদ্ধৃতির কিছু যে সম্পর্ক আছে, নিছক কানে শুনে তা তখন-তখনই বোঝা যায় না:

(৩) তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে
৫ ৪ ৫

('মানসী')

(৪) তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
৩ ৩ ৩ ৩ ২

('সোনার তরী')

এখানে চার নম্বর উদ্ধৃতিটি যে-ছন্দে তা এ-কবিতাতেই ('তোমরা ও আমরা') প্রথম দেখা দিলো, যদিও এ-কথা কাউকে মনে করিয়ে দিতে হবে না যে অধিক বিখ্যাত কবিতা 'শয়ন শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে' এই ছন্দেই লেখা এবং এ-ছন্দেরই যুক্তাক্ষরপ্রধান রকমফের পাওয়া যাবে 'হয়েছে কি তবে সিংহদুয়ার বন্ধ রে' ও 'তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর' এ দুটি কবিতায়।

উদ্ধৃত প্রতিটি পংক্তিই সাধারণ কাশীরাম দাসী পয়ারে অনায়াসে পরিণত করা যায়, যেমন:

নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী ছিলাম
পরানে কেন গো দিলে ভালোবাসা তবে
তোমরা হাসিয়া যাও বহিয়া চলিয়া

ইত্যাদি

এবং বিভিন্ন ছন্দগুলোও পরস্পরে পরিবর্তিত হ'তে পারে:

ছিলাম নিশিদিন প্রবাসী আশাহীন
ছিল সোনার খাঁচাটিতে খাঁচার পাখি
পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে তবে

ইত্যাদি

পয়ারের ছাঁচে ঢাললে যা অসহ্যরকম নির্জীব শোনায়, তা থেকে এত বিচিত্র, নতুন ও অপয়ার ছন্দের উদ্ভাবন, এবং যে-ছন্দগুলি পরস্পরের এত কাছাকাছি তাদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা যে কত বড়ো কীর্তি, বাংলা কবিতার পরিণতির এই স্তরেও তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। বস্তুত, এ-কবিতাগুলির আলোচনায়, কবিত্বশক্তির প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও, নিছক ছন্দের নৈপুণ্য, কবির virtuosity-ই পদে-পদে আমাদের মুগ্ধ করে।

তেরো মাত্রার রচনা 'মানসী'তেই প্রথম, কিন্তু 'সোনার তরী'তে এর সম্পূর্ণ নতুন রূপ:

(৫) আমার মোরে পাগল ক'রে দিবে কে
৫ ৫ ৩

(৬) গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
৩ ৩ ২ ২ ৩

কিংবা

কূলে একা ব'সে আছি নাহি ভরসা
৪ ৪ ৪ ১

(৭) তখন তরুণ রবি প্রভাতকালে
৩ ৩ ২ ৩ ২

৬ ও ৭-এ পার্থক্য সূক্ষ্ম হ'লেও স্পষ্ট, তারপর 'প্রত্যাখ্যানে' পাঁচ নম্বরের ছন্দেই নতুন স্বর লেগেছে মাঝের মিল বাদ গিয়ে :

(৮) অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না
৩ ২ ৩ ২ ৩

এবারে বারো মাত্রা দেখা যাক—

(৯) বেলা যে প'ড়ে এলো জলকে চল্
৩ ৪ ৩ ২

(১০) রচিয়াছিনু দেউল একখানি
৫ ৩ ৪

(১১) রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়
৩ ৪ ৫

(১২) রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে
৫ ৫ ২

দশ মাত্রা :

(১৩) ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম
৫ ৫

ন' মাত্রা :

(১৪) গগন ঢাকা ঘন মেঘে
৩ ৪ ২

পয়ারজাতীয় হ'লে এ সবগুলোই একই ছন্দ ব'লে গণ্য হ'তে পারতো, কিন্তু বিজোড়মাত্রার ছন্দ যেহেতু একেবারে ছাঁচে-ঢালা, মাপে-ছাঁটা, পয়ারের মতো তা টানলেও বাড়ে না, চাপলেও কমে না, সেহেতু এই উদাহরণগুলোর প্রতিটিকেই একটি স্বতন্ত্র ছন্দ ব'লে ধরলে দোষ হয় না। মাত্রাসংখ্যা যেখানে সমান, সেখানেও প্রতিটি ছন্দের বিভিন্ন স্বর, এবং এ-জাতীয় ছন্দ বাংলায় যে আগে কখনো ছিলো না সে-কথাও বলা বাহুল্য।

মনে হয়, 'সোনার তরী'র পরে রবীন্দ্রনাথ **নতুন** ছন্দ আর উদ্ভাবন করেন নি। তাঁর পরবর্তী সমস্ত কাব্যের বিচিত্র ছন্দের মূল রূপগুলি পাওয়া যাবে 'সন্ধ্যা সংগীত'-থেকে 'সোনার তরী'র মধ্যে। এর পরে তিনি বার বার পুরোনো ছন্দকে নতুন রূপ দিয়েছেন, এখনো দিচ্ছেন, এবং এ-কথাও আমাদের মনে

রাখতে হবে যে নতুন ছন্দ তৈরি করা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে উদ্ভাবনমাত্র, কিন্তু চিরকালের ছন্দকে নতুন ভঙ্গিতে ব্যবহার করা সর্বদাই সৃষ্টি। তিন মাত্রার ছন্দের এই যে অভিনব সম্পদ এখানে দেখা গেলো, তার ঝঙ্কার রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিলো কিন্তু আবিষ্ট করেনি, এর মধ্যে কোনো-কোনো ছন্দের ব্যবহার তাঁর সমগ্র কবিতায় খুবই পরিমিত, এবং খুব বেশি যেগুলো ব্যবহৃত, সেগুলো কবিতার চাইতে বরং গানেই স্থান পেয়েছে। বারো মাত্রার যে উদাহরণগুলো এখানে আছে সে-সব ছন্দে লেখা অন্য কবিতা পেতে হ'লে কৌতূহলীকে যথেষ্ট খুঁজতে হবে, বারো মাত্রার যে-ছন্দে কবির প্রশস্ততম ব্যবহার তার পাকা রূপটি দেখা গেছে 'মানসী'তেই, 'সোনার তরী'তে তা আছে 'পুরস্কারে' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রায়'

সেদিন বরষা ঝরঝর ঝরে
আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে

এই ছন্দ, পয়ার, এবং বাংলা ছড়ার ছন্দ, যা পয়ারজাতীয়ই ('বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এলো বান'), এ তিনটিই রবীন্দ্র-কাব্যে নতুন-নতুন চেহারায় ফিরে-ফিরে দেখা দিয়েছে, আজও দিচ্ছে।

অমিত্রাক্ষরে 'চিত্রাঙ্গদা'ই রবীন্দ্রনাথের শেষ রচনা, যতদিন না তিনি 'পরিশেষে' সমসাময়িক বিষয়োপযোগী অসমমাত্রার অভিনব অমিত্রাক্ষর উদ্ভাবন করলেন। 'চিত্রাঙ্গদা'র অমিত্রাক্ষর 'বিসর্জনে'র চাইতে শুধু উৎকৃষ্ট নয়, অন্য জাতের। এ-অমিত্রাক্ষর বীণার মতো বাজে, এ একেবারেই বিশুদ্ধ লিরিকের যন্ত্র। 'বিসর্জনে' যেটুকু ঘটনা ও চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত, এখানে তাও নেই, 'চিত্রাঙ্গদা'কে কবি নাটক করতে চানই নি, এ কথোপকথনের ছলে লেখা একটি দীর্ঘ গীতিকবিতা। লিরিকের একটি লক্ষণ তার ক্ষুদ্রতা, কারণ কবিদের মনেও লিরিক লেখবার উপযোগী অবস্থা বেশিক্ষণ থাকে না, এবং একজন ইংরেজ কবি একবার এমন মতও প্রকাশ করেছিলেন যে কবিতার সারবস্তুই লিরিক, এপিক কি ড্রামাটিক কাব্যের যে-যে অংশ লিরিকজাতীয় সেগুলোর জন্যেই তাদের মূল্য, বাকিগুলো জোড়া দেবার কলকব্জামাত্র। এ-মত আমরা মানি আর না-ই

মানি, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে দীর্ঘ আখ্যান-কবিতায় এমন অংশ বিরল নয়, পাঠককে একটি দরকারি খবর দেয়া ছাড়া যার অন্য সার্থকতা নেই। কিন্তু 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রায় প্রতি ছত্রে, প্রতি শব্দে রয়েছে লিরিকের সদ্যোজাত সৌরভ, যে-কোনো চরিত্রের যে-কোনো উক্তি বার-বার পড়বার মতো, কারণ এমন উক্তি প্রায় নেই বললেই চলে যা বিশেষ-কোনো কথা বলে না, শুধু একটি খবর দিয়েই শেষ হয়। বলা বাহুল্য, প্রকৃত নাটকে এ-জিনিস সম্ভব হয় না, তাই রবীন্দ্রনাথ নাটকত্ব বর্জন ক'রে 'চিত্রাঙ্গদা'কে একটি মহৎ গীতিকবিতা ক'রে তুলেছেন। ছোটো-ছোটো দৃশ্যগুলি পড়তে-পড়তে নাটকের ছবি কখনোই চোখের সামনে ফোটে না, বরং মনে হয় এ যেন কোনো ব্যালে নৃত্যের ভাষায় রূপান্তর। মনে হয়, প্রেমের ব্যাপারে নারীর সৌন্দর্যই তার সপত্নী, এই ভাবটি এতই সূক্ষ্ম যে একে ফোটাতে হ'লে মানুষী কথোপকথনে কুলোয় না, কাব্য কি নৃত্যের আশ্রয় নিতে হয়। নৃত্য-নাট্য হিসেবে 'চিত্রাঙ্গদা'র যে বিশেষ সার্থকতা তা দৈবাৎ হয়নি, তার কারণ আছে ঐ কাব্যেই। নাচের মতোই অবাধ-লীলায়িত গতিতে সমস্ত কবিতাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব'য়ে গেছে, নাচের মতোই এর নিটোল অথচ সংযত সম্পূর্ণতা, একটি কথা বেশি নেই, একটি কথা কম নেই। এতখানি দীর্ঘ কবিতায় আগাগোড়া লিরিকের দীপ্তি কোথাও ম্লান হয়নি, যা বলা হ'লো তার ফাঁকে-ফাঁকে না-বলার গুঞ্জন কোথাও থেমে যায়নি। এ আশ্চর্য।

'গোড়ায় গলদে'র পুরোপুরি নাটক হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু চমৎকার অভিনয়োপযোগী কয়েকটি দৃশ্য সত্ত্বেও বইটি ঠিক রঙ্গমঞ্চের মানানসই হয়নি; বন্ধুরা যে-সময় হাস্যালাপে রত, সেই একই সময় মেয়েরা অন্তঃপুর থেকে মন্তব্য করছেন, এ তো একাধিকবার আছে, তাছাড়া প্রথম দৃশ্যটি সুখপাঠ্য হ'লেও অভিনয়ে মনে হবে শ্লথ ও কথায় বোঝাই। অবশ্য এ-সব আপত্তির কথা এখন হয়তো তোলাই উচিত নয়, কারণ 'গোড়ায় গলদে'র পরিমার্জিত রূপ যে 'শেষ রক্ষা' তাতে এ-সব ত্রুটি নেই, নাটক হিসেবে সেটি নিখুঁত। তাছাড়া এ-ও সত্য নয় যে এ-সব ত্রুটিই 'গোড়ায় গলদে' বড়ো হ'য়ে উঠেছে, বরং

এই হাস্যরসময় নাটকের গুণাবলীর কাছে ত্রুটিগুলোই তুচ্ছ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এর চরিত্রচিত্রণে নৈপুণ্যের অভাব নেই, নব্যযুবকদের প্রত্যেকেই বিশিষ্ট, একজন থেকে আর-একজনকে সহজে চিনে নেয়া যায়, এমন কি এই চারিত্রগুণ থেকে বেচারা নলিনাক্ষও ভ্রষ্ট হয়নি, কমলমুখী ইন্দুমতীও আলাদা। 'মাইনর' চরিত্রচিত্রণেই নাট্যকারের প্রতিভার গভীরতা বোঝা যায়; যে-চরিত্রের বিশেষ কিছু করবার কি বলবার নেই, তাকে কোনোরকমে একটি কলের পুতুল বানিয়ে ছেড়ে দিয়েই সাধারণ নাট্যকার কাজ সারেন, প্রতিভাবান তাকে জীবন্ত ক'রে তোলেন। হতভাগ্য নলিনাক্ষ সাতেও নেই পাঁচেও নেই, সকলের পিছে-পিছে সে ঘুরে বেড়ায়, অথচ কেউ তাকে পোঁছে না, সে না বলে একটা ব্রিলিয়েন্ট কথা, না আছে ঘটনার পরিণতিতে তার কোনো হাত, তবু যে সে পাঠকের মনে ছাপ রেখে যায়, তবু যে তাকে আস্ত, জ্যান্ত, এবং খুব চেনা-চেনা একটা মানুষ মনে হয়, লেখকের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এটাই, চন্দ্রকান্তের চরিত্র নয়। কাহিনীর দিক থেকে এ-নাটক বার-বার শেক্সপিয়রের নাটকের কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়,—সেই দুই যুগল, মধ্যবর্তী বন্ধু, সেই ছদ্মবেশ ও ভ্রান্তিবিলাস, আর শেষ পর্যন্ত সুখের বৈকুণ্ঠলোক। ইন্দুমতী ও কমলামুখীও শেক্সপিরীয় কমেডির নায়িকাদের মতোই বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, প্রত্যুত্তরে চতুর, যেমন হাস্যময়ী তেমন সাহসিকা, মোটেও নেহাৎ ভালো, নেহাৎ বাধ্য, প্রায় জড়পদার্থ আদর্শ বঙ্গবালিকা নয়, অথচ মনে-মনে একান্তই মেয়ে। যে-নাটকে এতগুলি সজীব চরিত্র, এমন উদার, অকুণ্ঠ, প্রায় বেপরোয়া, অথচ কটূক্তি কি অত্যুক্তিহীন হাস্যরস, তাকে প্রহসন বলাই ভুল; বাংলাভাষায় যে অল্প কয়েকটি ভালো কমেডি আছে এ তারই একটি।

'রচনাবলী'তে 'চোখের বালি'র 'সূচনায়' রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন যে এটি বাংলাভাষার প্রথম 'সাইকলজিকাল' উপন্যাস। 'নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় মূর্তি গ'ড়ে উঠতে থাকে। মানব-বিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলাভাষায় আর প্রকাশ পায় নি।' সাদা কথায়,

'চোখের বালি' সেই জাতের উপন্যাস যার নির্ভর চমকপ্রদ ঘটনায় নয়, মানুষের মনস্তত্ত্বে। মানুষ যা করে সেটা প্রকাশ্য, যা ভাবে সেটা অনেক সময় তার নিজের কাছেও গোপন। সেই মনের অন্ধকারকে নির্মম আলোয় প্রকট করাই যে ঔপন্যাসিকদের মহত্তম কর্তব্য, তার প্রথম সচেতনতা বাংলা সাহিত্যে 'চোখের বালি'তে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে, বইটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, বিনোদিনীর দীপ্ত, দৃপ্ত মূর্তি দেখে হিন্দুসমাজ যে কী আতঙ্কে চোখ বুজেছিলো তা অনুমান ক'রে রোমাঞ্চিত হ'তে হয়। তখন এ-বই লিখতে যে-সাহসের দরকার হয়েছিলো তা দুঃসাহস। কিন্তু শুধু দুঃসাহসের জন্যই 'চোখের বালি' সম্মানযোগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস এইটি; এবং যদিও বইটির গঠন শিথিল, অনেক স্থলেই ঘটনাগুলিকে নাটকীয়-রূপে দেখানো হয়নি, অতি সরলভাবে ব'লে দিয়েই লেখক খালাস হয়েছেন, যদিও পাত্রপাত্রীরা অনেক সময় 'তাদের স্রষ্টিকর্তার সুবিধা মতোই চলাফেরা করে, চিঠি লেখে কি চিঠি খুঁজে পায় এবং সর্বদাই সাধুভাষায় কথা বলে, তবু বইটি পড়তে-পড়তে আজও আমাদের মন গভীরভাবে আন্দোলিত হয়, স্বীকার করতেই হয় পাত্রপাত্রীর সত্তা, তাদের সুখদুঃখ সংশয় সংগ্রামের বাস্তবতা। বস্তুত, আখ্যানের যে অত্যধিক সরলতা আমাদের মনে ঈষৎ অতৃপ্তি রেখে যায় তার জন্য দায়ী লেখকের অসতর্কতা নয়, তাঁর সাত্ত্বিক স্বভাব। এই দারুণ ভাঙচুরের গল্প যে আগাগোড়া এমন একটি নিচু পরদায় তিনি বাঁধতে পারলেন ও সেই একই পরদায় রাখতে পারলেন এটাই আশ্চর্য। কখনো তিনি চেঁচিয়ে কথা বলেন না, কখনো উত্তেজিত হন না, এক জায়গায় কম জোর দিয়ে অন্য জায়গায় বেশি জোর দেন না—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি শান্ত ভাব গল্পটিকে জুড়ে রয়েছে। এই সমতলতা, কণ্ঠস্বরের এই একই পরদা, স্বীকার করবো, আজকাল আমাদের ভালো লাগে না। আমাদের মনে হয় পদে-পদে লেখক অপূর্ব সুযোগ হেলায় হারাচ্ছেন। বাংলার নগণ্য গ্রামের স্নিগ্ধ পটভূমিকায় বিনোদিনী প্রথম যখন আমাদের চোখে পড়লো, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এলাহাবাদের বাগানবাড়িতে বিনোদিনী আর বিহারীর সাক্ষাৎ, বিহারীধ্যানমগ্ন বিনোদিনীর

অসুখী পল্লীগৃহে হঠাৎ উন্মাদের মতো মহেন্দ্রের আবির্ভাব—এ-সব ঘটনা কি সাধারণ দুটি একটি লাইনে বলবার? আজকাল 'চোখের বালি' পড়তে-পড়তে বার-বার আমাদের মনে হবে যে লেখক উপন্যাসের টেকনিক সম্বন্ধে বিশেষ ভাবিত ছিলেন না, একটি গল্প তাঁর মনে এসেছিলো, এবং সে-গল্প তখনকার প্রচলিত প্রথায় আদ্যোপান্ত ব'লেই তিনি নিজের দায়িত্ব মোচন করেছেন। কিন্তু এই অতৃপ্তিবোধ যেমন এড়ানো যায় না, তেমনি এ-চেতনাও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে এই যে সরল, সমতলভাবে একটি গল্প ব'লে যাওয়া, কোনোখানে জোর না দেয়া, কোনোখানে অদৃশ্য অণ্ডারলাইন চিহ্ন না আঁকা, গল্পের দারুণতম মুহূর্তেও রচনার প্রশান্তি বজায় রাখা—এর পিছনে যে-সাত্ত্বিক স্বভাব আছে তা অতি দুর্লভ। আসলে এই প্রশান্তিই আঙ্গিকের দুর্বলতার ক্ষতিপূরণ করেছে, নয়তো এই সমতল কথকতা আমাদের সমস্ত চিত্তকে আজও দখল ক'রে রাখে কিসের জোরে?

কিন্তু 'চোখের বালি' সম্বন্ধে একটি আপত্তি জানাতেই হয়; বইটির সমাপ্তি অতি দুর্বল। সত্যি বলতে, শেষ পাতাটি প'ড়ে বিশ্বাসই হ'তে চায় না যে এখানেই, এই জোড়াতালি-দেয়া প্রাণহীন রফাতেই এ তীব্র উপাখ্যানটির শেষ। যে-বিনোদিনী তার দৃপ্ত যৌবন, তার রুদ্ধ বাসনার চাপা আগুন নিয়ে মহেন্দ্রের সংসারে জট পাকিয়ে তুললো, 'চোখের বালি'র আগাগোড়া সে-ই রেখেছে উদ্দীপিত ক'রে, কাপুরুষ মহেন্দ্র নয়, গোবেচারা ভালোমানুষ আশা নয়, অমানুষিক কি অতিমানুষিক বিহারী নয়। যে-মুহূর্তে জট পাকালো, যে-মুহূর্তে বিনোদিনী মূঢ় আশাকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার ক'রে দুই বন্ধুর জীবনের মধ্যে উপস্থিত হ'লো, সেই মুহূর্তেই আমরা জানলুম যে এ-গল্পের দুটিমাত্র পরিণতি হ'তে পারে—এক, সম্পূর্ণ সর্বনাশ, আর তা যদি না হয়, বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর মিলন। গল্পের মাঝামাঝি এসেই বোঝা যায় যে লেখক ট্র্যাজিডির দিকে যাচ্ছেন না, তাহ'লে আশার অনুপস্থিতিতে মহেন্দ্রের ঘরে সেই বসন্তের মদির দুপুর তিনি ব্যর্থ হ'তে দিতেন না। তখনই আমরা বুঝি যে হতচেতন মহেন্দ্রকে অবলম্বন ক'রে বিনোদিনী তার প্রেমের তীর্থে পৌঁছবেই। আর তার

পরেও যখন লেখক বিনোদিনীকে মহেন্দ্রের প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করলেন, তখন এত বড়ো অস্বাভাবিকতাও আমরা মেনে নিই শুদ্ধ এই কারণে যে বিহারীর সঙ্গে তার মিলনের জন্য এটাই দরকার। অবশেষে এলাহাবাদের বাগানবাড়িতে বিহারী যখন এলো, এবং বিনোদিনীর সঙ্গে তার বোঝাপড়াও হ'লো, তখন যে বিনোদিনী তার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে সেটা স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক লজ্জা ব'লেই মনে হয়; কিন্তু সত্যি-সত্যি যখন বিবাহ হ'লো না, রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুশয্যায় মহেন্দ্র যথারীতি অনুতপ্ত হ'লো, আশা যথারীতি মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হ'লো, জমিদারির আর হাজার টাকার নোটের আদানপ্রদান হ'লো, আর তারপর সত্যি-সত্যি সমস্ত জীবনযৌবন বিসর্জন দিয়ে বিনোদিনী ব্রহ্মচর্য পালন করতে কাশী চ'লে গেলো, তখন আমাদের স্তম্ভিত মনে বার-বার শুধু এই প্রশ্নই জাগে যে এত যে ঝড় বইলো, ঢেউ উঠলো, আমাদের অনুভূতিগুলির উপর দিয়ে এত যে টানাহেঁচড়া গেলো, এই যে তুমুল বিপ্লবে এতক্ষণ আমরা আন্দোলিত হ'লাম—তা কি এইজন্যে, শুধু এইজন্যে?

বস্তুত, বিনোদিনীর এই তুচ্ছ পরিণাম আমাদের মন কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না, কেবলই মনে হয়, এ মিথ্যা, এ ফাঁকি। শেষ পরিচ্ছেদটি গল্পের আভ্যন্তরীণ উপাদান থেকে অনিবার্যভাবে গ'ড়ে ওঠেনি, এটি উপর থেকে বসানো হয়েছে, ছাপার অক্ষরে যা ঘটলো জীবনেও তাই ঘটেছিলো এ আমাদের বিশ্বাস হয় না, মনে হয় এটুকু লেখকের মনগড়া। আর এ-কথা ভেবে আমাদের বিস্ময় কিছুতেই শেষ হয় না যে হস্তলিপিপুস্তকের নীতিবচনের কাছে লেখক বিনোদিনীকে ও তাঁর শিল্পী বিবেককে বলি দিলেন কেমন ক'রে? শেষ পর্যন্ত এই মীমাংসাতেই আমাদের পৌঁছতে হয় যে যে-শুভ সাহস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি আরম্ভ করেছিলেন, শেষ মুহূর্তে তা তাঁকে ত্যাগ করেছিলো; তাই হিন্দু বিধবার বিবাহ ঘটাতে তিনি সাহস পাননি, জীবন যাকে কিছুই দেয়নি অথচ সম্পূর্ণভাবে যে জীবনের যোগ্য তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে হীনচেতা দীনস্বভাব মহেন্দ্র, নষ্ট হবার পুরোপুরি ইচ্ছা যার আছে, অথচ পুরোপুরি নষ্ট হবারও শক্তি নেই, তাকে ফিরিয়ে দিলেন তার সুখের সংসার। এ অবিচার জীবনে নিত্যই ঘটছে

ব'লেই একে সাহিত্যে পাংক্তেয় বলি কেমন ক'রে—কারণ জীবনের তো কাউকে বিশ্বাস করাবার বালাই নেই, তাই যে-কোনো অরাজকতা সেখানে সম্ভব; সাহিত্যের প্রধান দায় লোককে বিশ্বাস করানো, তাই তা অসংখ্য নিয়মে বাঁধা।

তবু, পরিশেষের এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও, বিনোদিনী চরিত্রের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, তার উজ্জ্বল মূর্তি সহজে আমাদের মন থেকে মোছে না, তার মধ্যে দেখতে পাই 'চতুরঙ্গে'র দামিনীর পূর্বাভাস। কোনো প্রকৃতিপন্থী ফরাসি ঔপন্যাসিকের হাতে পড়লে বিনোদিনীর যে-মূর্তি ফুটতো তাতে দয়ামায়ার লেশমাত্র থাকতো না, রুদ্ধ বাসনার চরিতার্থতার আগুন দাউ-দাউ ক'রে জ্বলতো, চারদিকের সকলকেই জ্বালাতো, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে শয়তানী করেননি, শয়তান আঁকা তাঁর ধাতেই নেই। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় একবার লিখেছিলেন, 'রবীন্দ্রসাহিত্যে devil নেই, কেননা বিশ্বসৃষ্টিতে devil নেই।' এ-বাক্যের শেষাংশ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো, কিন্তু প্রথমাংশের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। বিনোদিনীর প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথ বরাবর বজায় রেখেছেন ব'লেই শেষ মুহূর্তের অবিচারের অন্যায় আরো বড়ো হ'য়ে ধরা পড়ে, অথচ 'চোখের বালি'তে যে-চরিত্র সত্যই ঘৃণ্য, অর্থাৎ মহেন্দ্র, তাকে কোনো শাস্তিই তিনি দিলেন না। যে-মহত্তর নীতিজ্ঞান ঔপন্যাসিকের কাণ্ডারী, তার বিচারে এ-সমাপ্তির কোনোই সমর্থন নেই।

'চোখের বালি' 'বঙ্গদর্শনে'র নবপর্যায়ে প্রথম প্রকাশিত হয়, 'আত্মশক্তি'র প্রবন্ধগুলিও তা-ই। বঙ্কিম বাংলায় যে উচ্চতর সাংবাদিকতার প্রবর্তন করেন, রবীন্দ্রনাথের হাতে তা যে কতদূর সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে তার পরিচয় আছে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে', আছে 'সাধনা'য়, 'সবুজপত্রে'। বিতর্কে, সমসাময়িক সমস্যার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের লেখনী যে কতবার ও কতটা ফলপ্রসূভাবে নিয়োজিত হয়েছে, তার সম্পূর্ণ ধারণাও হয়তো আমাদের নেই, কারণ আমি যতদূর জানি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁর সব প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে এখনো সংগৃহীত হয়নি,

আশা করি 'রচনাবলী'তে হবে। বঙ্গ-ভঙ্গ যুগের বাঙালির স্বাদেশিকতা তার শ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনা পেয়েছে 'আত্মশক্তি'র এই প্রবন্ধগুলিতে। এগুলো প্রায় সবই জনসভায় বক্তৃতা হিসেবে পঠিত হয়, স্থতরাং সেই স্মরণীয় আন্দোলনের সমস্ত উত্তাপটুকু রক্ষিত হয়েছে। এ-প্রবন্ধগুলিতে ভারতের যে-পরিকল্পনা ফুটেছে তা সম্পূর্ণ হিন্দু, এবং অনেকখানি ফিউডল ভারত, কোনো-কোনো বিষয়ে তা আধুনিক গান্ধীবাদের সঙ্গে হুবহু মেলে, আবার কোনো-কোনো বিষয়ে আধুনিক রবীন্দ্রবাদের সঙ্গে মেলে না। আমি এমন কথা বলতে চাইনে যে পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের মত অস্বীকার করেছেন যদিও সেটাও বিশেষ দোষের কথা নয়, কারণ প্রাণের ধর্মই পরিবর্তন। আমি বরং বলবো যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবিকতার বীজ ছিলো তাঁর স্বদেশপ্রেমেই, ভিক্ষাকে তিনি যেমন ঘৃণা করেছেন, বিদ্বেষ কি ঈর্ষাকেও রেখেছেন দূরে, ভারতে ইংরেজ আসবার যে প্রয়োজন ছিল, সে-কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি, মার্ক্সিস্ট না হ'য়েও ভারতে ইংরেজকে তিনি ইতিহাসের যন্ত্ররূপেই দেখেছেন। এ-প্রবন্ধগুলিতে তিনি বলতে চেয়েছেন যে ভারতে রাষ্ট্র কোনোদিন প্রভাবশীল ছিল না; সাধারণের জীবন ছিল সমাজের হাতে; এবং বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনে থেকেও আত্মশক্তির দ্বারা সেই সমাজকে আবার আমরা জীবন্ত ক'রে তুলতে পারি, এবং তাতেই অনেক সমস্যা চোকে। অর্থাৎ গ্রামে-গ্রামে আমরা পুকুর কাটতে পারি, ইস্কুল হাসপাতাল পঞ্চায়েৎ স্থাপন করতে পারি, নিজেরা যা করতে পারি তা রাষ্ট্রের হাতে, এমনকি স্বরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়া তিনি বলেন ভারতের ধর্ম নয়। এমনকি মহাজনপ্রথার বদলে সরকারি সমবায়ব্যাঙ্কেরও তিনি সমর্থন করেননি। দেশের ধনীরা গ্রামবাসী হবেন এবং সাধারণের জন্য অর্থব্যয় করবেন, কর্মীদের পোষণের ভার থাকবে সাধারণেরই হাতে, যারা আবার ধনীর উপর নির্ভরশীল—সরল, অনাড়ম্বর ভারতীয় জীবন মৃদুমন্থর লয়ে কেটে যাবে, উপেক্ষা করবে রাষ্ট্রীয় ঝড়-ঝাপটা, যেমন পূর্বে বহুবার করেছে। মোটের উপর যদি বলা যায় যে এ-প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ সামন্ততন্ত্রের প্রতিই পক্ষপাত দেখিয়েছেন তাহ'লে বিশেষ আপত্তির উপলক্ষ্য ঘটে না, তবে দেশীয় রাজ্য অর্থাৎ নেটিভস্টেট

গুলিতেই আমরা স্বদেশের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পাই এ-মত আজকালকার দিনে কী-রকম শোনায় তা গুরুদেবকে ব'লে দেবার স্পর্ধা আমি রাখিনে। দেশীয় রাজ্যের উপর তাঁর যখন এতখানি ভরসা ছিল তখন পরবর্তী অভিজ্ঞতাপ্রসূত মোহমুক্তি তাঁর পক্ষেই রূঢ়তম।

আশ্চর্য এই যে এ-প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ভারতের যে-আদর্শ এঁকেছেন, তার পিছনে যে জীবনদর্শন আছে সেটা বদলে দিলেই তা অত্যন্ত প্রগতিশীল রাষ্ট্রচিন্তার সমপর্যায়ে এসে পড়ে। রাষ্ট্রের বদলে সমাজের হাতেই সব ক্ষমতা থাকবে, এমনকি রাষ্ট্র ব'লে কিছু থাকবেই না, সমাজকেই আমরা সব দেবো, এবং সমাজের হাত থেকে সব নেবো, এ-কথা অত্যন্ত আধুনিক। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম বা গ্রামপুঞ্জ গঠনের আদর্শ সমস্ত দেশে সোভিয়েট স্থাপনের পরিকল্পনার খুব কাছাকাছি। প্রভেদ এই যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সমাজে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের উপরেই নির্ভর, জীবনযাপন অত্যন্ত সরল, অর্থাৎ আধুনিক বিচারে জীবনযাপনের মান অত্যন্ত নিচু, এবং রক্ষণশীলতা একান্ত প্রয়োজন; আর যে-সমাজের বিকাশে রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে, তাতে জীবনযাপন জটিল ও বিচিত্র, জীবনযাপনের মান সকলের পক্ষেই যথাসম্ভব উঁচু. তার মধ্যে আছে সমগ্র মানবজাতির আমূল পরিবর্তনের পরিকল্পনা, নতুন এক সভ্যতার উন্মেষ। আমরা যদি বলতে পারি যে এই বিজ্ঞাননির্ভর বিরাট জটিল সভ্যতা আমরা প্রত্যাখ্যান করবো, মাঠের শস্য, নদীর জল আর রাত্রে চাঁদ যে-স্নিগ্ধ আলো দেয় তাতেই আমদের চলবে, তাহ'লে আমরা, অর্থাৎ এই নগণ্য ভারতীয়রা, রক্ষা পাই, তা ঠিক; আর যদি আমরা বলতে পারি যে বিজ্ঞানের সমস্ত শক্তি আমরা নেবো, সভ্যতাকে আরো জটিল আরো বৃহৎ ক'রে তুলবো, কিন্তু সমাজের এমন ব্যবস্থা করবো যাতে সভ্যতার মহামূল্য উপঢৌকনগুলি সকলেরই অধিগম্য হয়, তাহ'লে আমরা, অর্থাৎ এই মানবজাতি, রক্ষা পাই, তাও ঠিক। এ দুয়ের মধ্যে কোন পন্থা বরেণ্য, এই নির্বচনের ভারও হয়তো আমাদের হাতে নেই, সময়ই হয়তো নির্বাচন করে, আমরা যুগপ্রেরণা পালন করি মাত্র। সে যা-ই হোক্, এ-বিষয়ে 'আত্মশক্তি'র প্রবন্ধগুলির সঙ্গে ভাবুকমাত্রেই একমত হবেন যে মতামত

নিয়ে কলহ না ক'রে যে কোনো একজন অধিনায়ককে ঘিরে আমরা সকলে যদি একত্র হই, এবং যে-কোনো আদর্শপ্রসূত কর্ম আন্তরিকভাবে গ্রহণ করি, তাহ'লে শেষ পর্যন্ত এ-জগতকে বিশ্বমানবের বাঞ্ছিত জগত ক'রে তুলতে পারবোই। এ-দিক থেকে এই প্রবন্ধগুলির সময়োপযোগিতা এখনো খর্ব হয়নি, এবং আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিণতির ইতিহাসে এ-গুলির স্থান বিশিষ্ট।

বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু ; সমর সেন; ৬১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রট "রংমশাল প্রেসে"
শ্রীকানাইলাল গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
কার্যালয় —কবিতা-ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ; কলিকাতা।

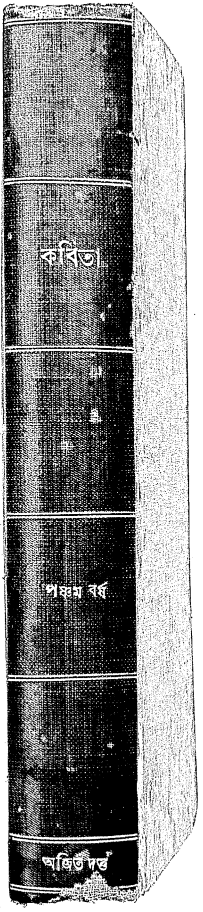
কবিতা
পঞ্চম বর্ষ
অজিত দত্ত